মাসিক

আল-আবরার

The Monthly AL-ABRAR

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৭, সংখ্যা-০৮

সেপ্টেম্বর ২০১৮ ইং, মুহাররম ১৪৪০ হি., ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৫ বাং

الأبرار

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

محرم الحرام ١٤٤٠هـ، ستمبر ٢٠١٨م

প্রতিষ্ঠাতা

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ

০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২

পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে : ৩

পবিত্র সুন্নাহ থেকে :

'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৪৫....... ৬

হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ৯

ইফাদাতে ফকীহুল মিল্লাত :

মধ্যপন্থাই কাম্য...১০

"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :

দুরূদ, সালাম ও প্রচলিত মীলাদের শরঈ বিধান........১৪
শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক্ব

ইসলামী হিজরী সনের স্মৃতি লুকিয়ে আছে বাংলা নববর্ষে ১৯
মাওলানা কাজী ফজলুল করিম

রাসূলুল্লাহ (সা.) মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি পড়তেন..... ২১
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী

মতভেদ কি শুধু নামাযের মাসায়েল নিয়ে?.......... ২৬
মুফতী লুৎফুর রহমান ফরায়েজী

মুবাল্লিগ ভাইদের প্রতি হযরতজির হেদায়াত-৮....... ২৮
মুফতী শরীফুল আজম

ফিকহে ইসলামী ও গাইরে মুকাল্লিদ-১ .... ৩৫
মুফতী শুআইবুল্লাহ খান মিফতাহী

হিজরী নববর্ষ ও আশুরা ৪১
কারী জসীমুদ্দীন কাসেমী

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪৬

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪৩২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১৮৩৮৪২৪৬৪৭ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

সম্পাদকীয়

সামাজিক অবক্ষয় রোধে ইসলামী শিক্ষার বিকল্প নেই

অবক্ষয় সমাজের উন্নয়নকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত করে। কোনো সমাজে অবক্ষয় নেমে এলে অন্যান্য উন্নয়ন যতই হোক না কেন, সমাজের সুখ-শান্তি পরাহত ও পরাভূত হয়। মূলত অবক্ষয় অর্থ হলো অধঃপতন, বিচ্যুতি। এক কথায় মানুষ নৈতিকতা ও মনুষত্বের সীমা থেকে নিচে নেমে যাওয়াকে অবক্ষয় বলা হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ(٦)

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি খুব সুন্দর আকৃতিতে। অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নিচে থেকে নিচে। কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার। (সূরা ত্বীন)

আরো ইরশাদ করেন–

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

যুগের কসম। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের। (সূরা আসর)

নীতি-নৈতিকতার পতনে সামাজিক অবক্ষয় নেমে আসায় মহানবী (সা.)-এর আগমনের আগে তৎকালীন আরবকে বলা হতো বর্বরতা ও অন্ধকার যুগ। তখন আরব দেশে চালু হয়েছিল অগ্নিপূজা, সূর্যপূজা, পালা-পার্বণ ও আনন্দ-উৎসব, মদ্যপান, ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ইত্যাদি। হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ হয়ে উঠেছিল তাদের সমাজে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এসব কারণে তাদের মধ্যে ভাষা-সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে বড় শিক্ষিত থাকলেও তাদের বলা হয় আয়্যামে জাহিলিয়্যাতের লোক।

বর্তমান সময়ে সামাজিক ও নৈতিক অপরাধগুলো মাত্রা অতিক্রম করতে চলেছে। যা সমাজকে ক্রম অধঃপতন ও অবক্ষয়ের দিকেই নিক্ষেপ করছে। যেমন সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা, দাম্পত্য কলহ ও স্বামী-স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসহীনতা, বিষণ্নতা ও খাদ্যে ভেজাল, হত্যা-লুণ্ঠন ইত্যাদি বেড়েই চলেছে। দুর্নীতির প্রাবল্য, অবিচার ও অনিয়ম, পদের লোভ, সম্পদের মোহ, তথ্য-প্রযুক্তির অপব্যবহার, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, মদ, জুয়ার প্রতি আসক্তি ইত্যাদি যেন সমাজের দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হচ্ছে। যা আরো বেগবান হলে সমাজের ও দেশের ধ্বংস অনিবার্য।

সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের মূল কারণ হলো ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব। ইসলামী শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা। আয়্যামে জাহিলিয়্যাতের অধঃপতিত সমাজকে সর্বোন্নত সমাজে পরিণত করেছিল ইসলামী শিক্ষা-ইলমে নববী (সা.)। আজ মুসলিম সমাজে তার প্রতিই বেশি উদাসীনতা এবং অবহেলা লক্ষ করা যায়। অথচ ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসে দৃঢ় এবং মহানবী (সা.)-এর নূরানী শিক্ষায় শিক্ষিত হলে মানুষ নৈতিকতা বিবর্জিত কাজে লিপ্ত হতে পারে না।

কারণ মানবসভ্যতা বিকাশের যতগুলো সদগুণের প্রয়োজন, ইসলাম তার সবই ব্যাখ্যা দিয়েছে। নীতি-নৈতিকতা ধ্বংসের পেছনে, মানুষকে পশু স্বভাবে উদ্বেলিত করতে যতগুলো দোষ ও অপকর্ম ক্রিয়াশীল, ইসলাম তা শুধু নিষেধই করেনি, বরং তার মূলোৎপাটনের ঘোষণাও দিয়েছে।

যেমন মদ-জুয়া, সুদ-ঘুষ প্রভৃতিকে সব অপকর্মের মূল আখ্যায়িত করে তা বর্জন করার কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমার বেদি ও জুয়ার তীর এসবই অপবিত্র, শয়তানী কাজ। সুতরাং এসব পরিহার করো, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন কর।' (সূরা মায়েদা, আয়াত : ৯০)।

ব্যভিচারকে অশ্লীল কাজ আখ্যা দিয়ে তার ধারেকাছে যেতেও নিষেধ করা হলো।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

'ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।' (সূরা বনী ইসরাইল ৩২)।

আরো ইরশাদ করেন–

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"যারা চায় ঈমানদারদের সমাজে নির্লজ্জতার বিস্তার ঘটুক, তারা পার্থিব এবং পরকালীন দুই জীবনেই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ-ই জানেন, তোমরা জানো না।" (সূরা নূর-১৯)

এরূপ প্রতিটি সৎকর্ম ও অপকর্মের পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা একমাত্র ইসলামেই আছে। প্রতিটি বিষয়ের স্তর নির্ণয়, পুরস্কার এবং তিরস্কারের মাপকাঠি, দুনিয়া আখেরাতে এর বদলা ও শাস্তির পূর্ণ ব্যাখ্যা ইলমে নববীতেই আছে। সে কারণে বলা যায় ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত হলে এবং ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম সমাজ কখনো সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ে নিমজ্জিত হতে পারে না। উল্লিখিত সূরা ত্বীন এবং আসরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা সেই দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

পরিশেষে মাসিক 'আল-আবরার'-এর পক্ষ থেকে সবার প্রতি ১৪৪০ হিজরী নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের আশা, ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসার ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে মুক্ত করার ব্রতি অর্জন করব ইনশাআল্লাহ।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা
২৯/০৮/২০১৮ ইং

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٦٢) لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (٦٣)

(৬২) আর আপনি তাদের অনেককে দেখবেন যে দৌড়ে দৌড়ে পাপে সীমালংঘন এবং হারাম ভক্ষণে পতিত হয়। তারা অত্যন্ত মন্দকাজ করছে। (৬৩) দরবেশ ও আলেমরা কেন তাদের পাপ কথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না? তারা খুবই মন্দকাজ করছে। (সূরা মায়েদা)

ইহুদিদের চারিত্রিক বিপর্যয় : প্রথম আয়াতে অধিকাংশ ইহুদির চারিত্রিক বিপর্যয় ও কর্মগত ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে শ্রোতারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং এসব কার্যকলাপ ও তার কারণ থেকে আত্মরক্ষা করে।

যদিও সাধারণভাবে ইহুদিদের অবস্থা তা-ই ছিল, তথাপি তাদের মধ্যে কিছু ভালো লোকও ছিল। কোরআন পাক তাদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করার জন্য। كثيرا (অনেকে) শব্দটি ব্যবহার করেছে। সীমালংঘন এবং হারাম ভক্ষণ اثم (পাপ) শব্দের অর্থেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উভয় প্রকারের পাপের ধ্বংসকারিতা এবং সে কারণে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার জন্য বিশেষভাবে এগুলোকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (বাহরে মুহীত)

তাফসীরে রূহুল মাআনী প্রভৃতিতে বলা হয়েছে যে তাদের সম্পর্কে দৌড়ে দৌড়ে পাপে পতিত হওয়ার শিরোনাম ব্যবহার করে কোরআন পাক ইঙ্গিত করছে যে তারা এসব কু অভ্যাসে অভ্যস্ত অপরাধী এবং এসব কুকর্ম মজ্জাগত হয়ে তাদের শিরা-উপশিরায় জড়িত হয়ে গেছে। এখন তারা ইচ্ছা না করলেও সেদিকেই চলে।

এতে বোঝা যায়, মানুষ সৎ কিংবা অসৎ যেকোনো কাজ উপর্যুপরি করতে থাকলে আস্তে আস্তে তা মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এরপর তা করতে কোনোরূপ কষ্ট ও দ্বিধা হয় না। ইহুদিরা কু অভ্যাসে এ সীমাই পৌঁছে গিয়েছিল। এ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছে يسارعون فى الاثم (তারা দৌড়ে গিয়ে পাপে পতিত হয়) সৎকর্মে পয়গম্বর ও ওলীগণের অবস্থাও তদ্রূপ। তাদের সম্পর্কেও কোরআনে বলা হয়েছে يسارعون فى الخيرات অর্থাৎ তারা দৌড়ে দৌড়ে পুণ্য কাজে আত্মনিয়োগ করে।

কর্ম সংশোধন পদ্ধতি : সূফী, বুযুর্গ ও ওলী আল্লাহগণ কর্মসংশোধনের সবচেয়ে অধিক যত্নবান। তাঁরা কোরআন পাকের এসব বাণী থেকেই মূলনীতি বেছে নিয়েছেন যে, মানুষ যেসব ভালো কিংবা মন্দকাজ করে আসলে সেগুলোর মূল উৎস হচ্ছে ওই সব গোপন কর্মক্ষমতা ও চরিত্র, যা মানুষের মজ্জায় পরিণত হয়। এ কারণেই মন্দকর্ম ও অপরাধ দমন করার জন্য তাঁদের দৃষ্টি এসব সূক্ষ্ম গোপন বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ থাকে এবং তাঁরা এগুলো সংশোধন করে দেন। ফলে সব কাজকর্ম আপনা থেকেই সংশোধন হয়ে যায়। উদাহরণত কারো অন্তরে জাগতিক অর্থলিপ্সা প্রবল হলে সে এর ফলে ঘুষ গ্রহণ করে সুদ খায় এবং সুযোগ পেলে চুরি-ডাকাতি পর্যন্ত করতে উদ্যত হয়। সূফী, বুযুর্গরা এসব অপরাধের পৃথক পৃথক প্রতিকার না করে এমন ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করেন, যদ্দরুন এসব অপরাধের ভিত্তিই উৎপাটিত হয়ে যায়। অর্থাৎ তাঁরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কল্পনায় এ কথা বদ্ধমূল করে দেন যে এ জগৎ ক্ষণস্থায়ী এবং এর আরাম-আয়েশ বিষাক্ত।

এমনিভাবে মনে করুন, কেউ অহংকারী কিংবা ক্রোধের হাতে পরাভূত। সে অন্যকে ঘৃণা ও অপমান এবং বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে। সূফী, বুযুর্গগণ এমন লোকের ক্ষেত্রে পরকালের চিন্তা এবং আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ব্যবস্থাপত্র প্রয়োগ করেন। ফলে উপরোক্ত মন্দ অভ্যাস আপনা থেকেই খতম হয়ে যায়।

মোট কথা, এ কোরআনী ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায় যে মানুষের মধ্যে এমন কর্মক্ষমতা রয়েছে, যা মজ্জায় পরিণত হয়ে যায়। এগুলো সৎকর্মক্ষমতা হলে সৎকাজ আপনা আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে এগুলো মন্দ কর্মক্ষমতা হলে মন্দকাজের দিকে মানুষ আপনাআপনি ধাবিত হয়। পূর্ণ সংশোধনের নিমিত্ত এসব কর্মক্ষমতার সংশোধন অত্যাবশ্যক।

আলেমদের কাঁধে সর্বসাধারণের কাজকর্মের দায়িত্ব :

দ্বিতীয় আয়াতে ইহুদি পীর-মাশায়েখ ও আলেমদেরকে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে তারা সাধারণ মানুষকে মন্দকাজ থেকে কেন বিরত রাখে না। কোরআন পাকে এ ক্ষেত্রে দুটি শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। একটি ربانيون এর অর্থ আল্লাহভক্ত, অর্থাৎ আমাদের পরিভাষায় যাকে দরবেশ, পীর কিংবা মাশায়েখ বলা হয়। দ্বিতীয়ত احبار ব্যবহার করা হয়েছে। ইহুদিদের আলেমদেরকে আহবার বলা হয়। এতে বোঝা যায় যে সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের মূল

দায়িত্ব এই দুই শ্রেণীর কাঁধে অর্পিত। এক. পীর ও মাশায়েখ এবং দুই. আলেমবর্গ। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, ربـــانيـــون বলে ওই সব আলেমকে বোঝানো হয়েছে, যারা সরকারের পক্ষ থেকে আদিষ্ট ও ক্ষমতাসীন এবং احبار বলে সাধারণ আলেমবর্গকে বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় অপরাধ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব শাসককুল ও আলেমকুল উভয়ের কাঁধে ন্যস্ত হয়ে যায়। অন্যান্য কতিপয় আয়াতেও এ বিষয়টি স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে।

আলেম ও পীর-মাশায়েখের প্রতি হুঁশিয়ারি :

আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে لَبِئْس مـا كـانـوا يـصنعون অর্থাৎ সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার কর্তব্যটি ত্যাগ করে এসব মাশায়েখ ও আলেম অত্যন্ত বদভ্যাসে লিপ্ত হয়েছে, জাতিকে ধ্বংসের দিকে যেতে দেখেও তারা বাধা দিচ্ছে না।

তাফসীরবিদ আলেমগণ বলেন, প্রথম আয়াতে সর্বসাধারণের দুষ্কর্ম বর্ণিত হয়েছিল। এর শেষে لَبِئْس ما كانوا يعملون বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে মাশায়েখ ও আলেমদের ভ্রান্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এর শেষে لَبِئْس مـا كانوا يصنعون বলা হয়েছে। কারণ এই যে আরবী অভিধানের দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত সব কাজকেই فعل বলা হয়। عمل শব্দটি ওই কাজকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয় যা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় এবং صـنعـت ও صـنـع শব্দ ওই কাজের বেলায় প্রয়োগ করা হয়, যা ইচ্ছার সাথে সাথে বারবার অভ্যাস ও লক্ষ্য হিসেবে ঠিক করে করা হয়। তাই সর্বসাধারণের কুকর্মের পরিণতির ক্ষেত্রে عـمـل শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। لَبِئْس ما كانوا يعملون আর বিশিষ্ট মাশায়েখ ও আলেমদের ভ্রান্ত কাজের জন্য صنع শব্দ প্রয়োগে لَبِئْس مـا كـانـوا يصنعون বলা হয়েছে। এতে এদিকে ইঙ্গিত হতে পারে যে ইহুদিদের মাশায়েখ ও আলেমরা জানত যে তারা নিষেধ করলে সর্বসাধারণ শুনবে এবং বিরত থাকবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের উপঢৌকনের লোভে কিংবা মানুষের বদ ধারণার ভয়ে মাশায়েখ ও আলেমদের মনে সত্য সমর্থন করার কোনো আবেদন জাগ্রত হতো না। এ নিস্পৃহতা সেসব দুষ্কর্মীর দুষ্কর্মের চেয়েও গুরুতর অপরাধ।

এর সারমর্ম এই যে, কোনো জাতি অপরাধ ও পাপে লিপ্ত হলে তাদের মাশায়েখ ও আলেমরা যদি অবস্থাদৃষ্টে বুঝতে পারে যে তারা নিষেধ করলে জাতি অপরাধ থেকে বিরত হবে, তবে এমতাবস্থায় কোনো লোভ কিংবা ভয়ের কারণে অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত না রাখলে মাশায়েখ ও আলেমদের অপরাধ প্রকৃত অপরাধের চেয়ে গুরুতর হবে। তাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মাশায়েখ ও আলেমদের জন্য সমগ্র কোরআনে এ আয়াতের চেয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি আর কোথাও নেই। তাফসীরবিদ যাহহাক বলেন, আমার মতে মাশায়েখ ও আলেমদের জন্য এ আয়াত সর্বাধিক ভয়াবহ। (ইবনে জরীর ও ইবনে কাসীর)

কারণ এই যে আয়াতদৃষ্টে তাদের অপরাধ সব চোর, ডাকাত ও দুষ্কর্মীদের অপরাধের চেয়েও কঠোর হয়ে যায়। (নাউজু বিল্লাহ) কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে অপরাধের তীব্রতা তখনই হবে, যখন মাশায়েখ ও আলেমরা অবস্থাদৃষ্টে অনুমানও করতে পারবে যে তাদের নিষেধাজ্ঞা শোনা ও মান্য করা হবে। পক্ষান্তরে যদি অবস্থাদৃষ্টে কিংবা অভিজ্ঞতার আলোকে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে তাদের নিষেধাজ্ঞা শুনবে না বরং উল্টো তাদের নির্যাতন করা হবে তবে তারা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে। কিন্তু উত্তম ও শ্রেষ্ঠ তরীকা তখনও এই যে কেউ মানুক বা না মানুক তারা স্বীয় কর্তব্য পালন করে যাবে এবং এই ব্যাপারে কারো নির্যাতন বা তিরষ্কারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। যেমন আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় মুজাহিদগণের গুণাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ولايـخافون لـــومة لائـــم অর্থাৎ তারা আল্লাহর পথে সংগ্রামে এবং সত্য প্রকাশে কোনো তিরষ্কারকারীর তিরষ্কারের পরোয়া করে না।

মোটকথা, যে ক্ষেত্রে কথা শোনা ও মান্য করার সম্ভাবনা বেশি সেখানে আলেম মাশায়েখ এবং প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে সাধ্যানুযায়ী পাপকাজে বাধাদান করা। হাতে হোক কিংবা মুখে অথবা কমপক্ষে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে নিষেধাজ্ঞা শোনা হবে না অথবা নিষেধকারীর বিরুদ্ধে শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, সেখানে নিষেধ করা ও বাধাদান করা ফরয নয়, তবে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ অবশ্যই। সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ সম্পর্কিত এ বিবরণ হাদীস থেকে সংগৃহীত হয়েছে। নিজে সৎকর্ম ও অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে অপরকেও সৎ কর্মের প্রতি পথপ্রদর্শন করা এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব সাধারণ মুসলমান প্রতিষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখার যোগ্য একটি মূলনীতি স্থাপন করছে। এটি যথাযথ বাস্তবায়িত হলে সমগ্র জাতি অনায়াসেই যাবতীয় দুর্নীতি থেকে পবিত্র হতে পারে।

উম্মতের সংশোধনের পন্থা :

ইসলামের প্রথমে ও পরবর্তী সমগ্র শতাব্দীগুলোতে যত দিন এ

মূলনীতি বাস্তবায়িত হয়েছে, তত দিন মুসলিম জাতি জ্ঞান-গরিমা, কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে সারা বিশ্বে সমুন্নত ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রয়েছে। পক্ষান্তরে যেদিন থেকে মুসলমানরা এ কর্তব্য পালনে বিমুখ হয়ে পড়েছে এবং অপরাধ দমনকে শুধু সরকার ও পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব মনে করে নিজেরা হাত গুটিয়ে বসেছে, সেদিন থেকেই মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করছে। আজ পিতা-মাতা ও গোটা পরিবার ধার্মিক ও শরীয়তের অনুসারী। কিন্তু সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মতিগতি চিন্তাধারা ও কর্মধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত। এ কারণেই জাতির সামগ্রিক সংশোধনের নিমিত্ত কোরআন-হাদীসের সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। কোরআন এ কর্তব্যটিকে উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য আখ্যা দিয়েছে এবং এর বিরুদ্ধাচরণ করাকে কঠোর পাপ ও শাস্তির কারণ বলে সাব্যস্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, কোনো জাতির মধ্যে পাপকাজ করা হয় অথচ কোনো লোক তা নিষেধ করে না, তখন তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব প্রেরণের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে যায়। (বাহরে মুহীত)

পাপকাজে ঘৃণা প্রকাশ না করার কারণে সতর্কবাণী :

মালেক ইবনে দীনার (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এক জায়গায় ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলেন যে অমুক জনপদটি ধ্বংস করে দাও। ফেরেশতারা আরজ করলেন, এ জনপদে আপনার অমুক ইবাদতকারী বান্দাও রয়েছে। নির্দেশ এল, তাকেও আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাও। কারণ আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখেও তার চেহারা কখনো ক্রোধে বিবর্ণ হয়নি। হযরত ইউশা ইবনে নুন (আ.)-এর প্রতি ওহী আসে যে আপনার জাতির এক লক্ষ লোককে আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হবে। এদের মধ্যে চল্লিশ হাজার সৎ লোক এবং ষাট হাজার অসৎ লোক। ইউশা (আ.) নিবেদন করলেন, হে রাব্বুল আলামীন! অসৎ লোকদের ধ্বংস করার কারণ তো জানাই আছে, কিন্তু সৎ লোকদের কেন ধ্বংস করা হচ্ছে? উত্তর এল, এ সৎ লোকগুলোও অসৎ লোকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখত। তাদের সাথে পানাহার ও হাসি-তামাশায় যোগদান করত। আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখে কখনো তাদের চেহারায় বিতৃষ্ণার চিহ্নও ফুটে ওঠেনি। (বাহরে মুহীত)

(তাফসীরে মাআরিফুল কোরআন অবলম্বনে)

মুসলিম দুনিয়ায় সর্বাধিক পঠিত অন্যতম কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৪৫

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখন ফাজায়েলে নামাযের উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

ফাজায়েলে নামায–তৃতীয় অধ্যায় :

খুশু খুজুর বর্ণনা :

হাদীস নং-১

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بَكْرٍ يَعْنِى ابْنَ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنَمَةَ الْمُزَنِىِّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلاَتِهِ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا

নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, মানুষ নামায পড়ে শেষ করে আর তার জন্য সওয়াবের দশ ভাগের এক ভাগ লেখা হয়। এমনিভাবে কারো জন্য নয় ভাগের এক ভাগ, কারো জন্য আট ভাগের এক ভাগ, সাত ভাগের এক ভাগ, ছয় ভাগের এক ভাগ, পাঁচ ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের এক ভাগ আর কারো জন্য অর্ধেক সওয়াব লেখা হয়।

(সুনানে আবু দাউদ ১/১১৫ হা. ৭৯৫, সহীহে ইবনে হিব্বান হা. ১৮৮৯, মুসনাদে আহমদ ৪/৩১৯, আল জামিউস সগীর ১/৪১৯ হা. ১৯৭৮, আস সুনানুল কুবরা [নাসাঈ] হা. ৬১২)

হাদীসটির মান : সহীহ

আরেকটি হাদীস :

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَسُرَيْجٌ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالُوا :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِلاَلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ الأَنْصَارِىِّ، عَنْ أَبِى الْيَسَرِ، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " :مِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّى الصَّلاَةَ كَامِلَةً، وَمِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّى النِّصْفَ، وَالثُّلُثَ، وَالرُّبُعَ حَتَّى بَلَغَ الْعُشْرَ "قَالَ سُرَيْجٌ فِى حَدِيثِهِ :حَتَّى بَلَغَ الْعُشْرَ

(মুসনাদে আহমদ ৩/৪২৭, আস সুনানুল কোবরা [নাসাঈ] হা. ৬১৩, আত তারগীব ওয়াত তারহীব হা. ৭৫১)

হাদীসটির মান : সহীহ

ক. বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে, মানুষের মধ্য হতে সর্বপ্রথম খুশু, অর্থাৎ নামাযের একাগ্রতা উঠিয়ে নেওয়া হবে। পুরো জামাতের মধ্যে এক ব্যক্তিকেও খুশুর সহিত নামায আদায়কারী পাওয়া যাবে না।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّاسِبِيِّ، ثنا مُهَلَّبُ بْنُ الْعَلاَءِ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ بَيَانٍ، ثنا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْخُشُوعُ

(সহীহে ইবনে হিব্বান হা. ৪৫৭২, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৯৯, সুনানে তিরমিযী হা. ২৬৫৩, আস সুনানুল কুবরা [নাসাঈ] হা. ৫৯০৫, আল মুজামুল কবীর [তাবারানী] ৭/২৯৫ হা. ৭১৮৩, মুসনাদে আহমদ ৬/২৬)

হাদীসটির মান : সহীহ

হাদীস নং-২

حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ :نا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ قَالَ :نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْجَوْنِ الْعَنْسِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَأَسْبَغَ لَهَا وُضُوءَهَا، وَأَتَمَّ لَهَا قِيَامَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا خَرَجَتْ وَهِيَ بَيْضَاءُ مُسْفِرَةٌ، تَقُولُ : حَفِظَكَ اللَّهُ كَمَا حَفِظْتَنِي، وَمَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا فَلَمْ يُسْبِغْ لَهَا وُضُوءَهَا، وَلَمْ يُتِمَّ لَهَا خُشُوعَهَا وَلَا رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا خَرَجَتْ وَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ، تَقُولُ :ضَيَّعَكَ اللَّهِ كَمَا ضَيَّعْتَنِي، حَتَّى إِذَا كَانَتْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ لُفَّتْ كَمَا يُلَفُّ الثَّوْبُ الْخَلَقُ، ثُمَّ ضُرِبَ بِهَا وَجْهُهُ

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي الْوَضَّاحِ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :إِذَا أَحْسَنَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا قَالَتِ الصَّلَاةُ :حَفِظَكَ اللَّهُ كَمَا حَفِظْتَنِي فَتُرْفَعُ، وَإِذَا أَسَاءَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا قَالَتِ الصَّلَاةُ :ضَيَّعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِي فَتُلَفُّ كَمَا يُلَفُّ الثَّوْبُ الْخَلَقُ فَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُهُ

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সময়মতো নামায আদায় করে, উত্তমরূপে ওজু করে, খুশু খুজুর সহিত পড়ে, ধীর-স্থিরভাবে নামাযে দাঁড়ায়, রুকু-সিজদাও উত্তম রূপে শান্তভাবে করে। মোটকথা, নামাযে সব কিছু উত্তমরূপে আদায় করে তার নামায উজ্জ্বল ও নূরানী হয়ে ওপরে যায় এবং নামাযীকে দু'আ দেয় যে আল্লাহ তা'আলা তোমার এরূপ হেফাজত করুন, যেই রূপ তুমি আমার হেফাজত করেছ। অন্যদিকে যে ব্যক্তি মন্দভাবে নামায আদায় করে, সময়ের দিকে লক্ষ রাখে না, ওজুও ভালোরূপে করে না, রুকু-সিজদাও ঠিকমতো করে না, তার নামায বিশ্রী ও কালো হয়ে বদ দু'আ দিতে থাকে যে আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুক যেভাবে তুমি আমাকে ধ্বংস করেছ। অতঃপর সেই নামাযকে পুরনো কাপড়ের মতো পেঁচাইয়া নামাযীর মুখের ওপর মেরে দেওয়া হয়।

(১. আল মুজামুল আওসাত ৩/৩৮৭ হা. ৩১১৭, আত তারগীব ওয়াত তারহীব হা. ৫৭২। ২. মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী ১/৩১০ হা. ৫৮৬, শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ৩/১৪৩ হা. ৩১৪০, মুসনাদে বাজ্জার ৭/১৪০ হা. ২৬৯১, জামিউল মাসানীদ ৭/৮১১ হা. ৪৮৫৮, আল জামিউস সগীর ১/৮৮ হা. ৩৬৪)

হাদীস দুটির মান : হাসান লিগাইরিহী

ক. রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে নামাযে কোমর ঝুঁকিয়ে উত্তমরূপে রুকু আদায় করা হয় না, তার উদাহরণ হলো ওই গর্ভবতী স্ত্রীলোকের মতো, যার প্রসবের সময় নিকটবর্তী হলে গর্ভপাত (বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়) হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের নারী গর্ভধারিণীও নয়, মাও নয়।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ، وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ كُتَّابِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ :نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَقَالَ : يَا عَلِيُّ، مَثَلُ الَّذِي يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي صَلَاتِهِ كَمَثَلِ الْحُبْلَى حَمَلَتْ، فَلَمَّا دَنَا نِفَاسُهَا أَسْقَطَتْ، فَلَا هِيَ ذَاتُ حَمْلٍ، وَلَا ذَاتُ وَلَدٍ

(মুসনাদে আবু ইয়ালা ১/১৮৯ হা. ৩১০, জামিউল মাসানীদ ১৯/১৯০, আল ইতহাফ [আল বুসিরী) ২/৩৭৭ হা. ১৯২৯, আত তারগীব ওয়াত তারহীব [ইসবাহানী] হা. ১৮৮৬, আততারগীব ওয়াত তারহীব [মুনযিরী] হা. ৭৪৪)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

খ. এক হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, অনেক রোযাদার ব্যক্তি এমন রয়েছে, যাদের রোযা দ্বারা শুধু ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট ছাড়া আর কিছুই হাসিল হয় না। এমনিভাবে অনেক রাত্রি জাগরণকারী শুধু জাগরণের কষ্ট ছাড়া আর কিছুই পায় না।

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنِ بْنِ السَّمَيْدَعِ الْأَنْطَاكِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ :قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ، وَالْعَطَشُ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ

(সহীহে ইবনে খুযাইমা হা. ১৯৯৭, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪৩১, সহীহে ইবনে হিব্বান হা. ৩৪৮১, মুসনাদে দারামী ২/৭৫৭ হা. ২৬২০, মুসনাদে আহমদ ২/৩৭৩)
হাদীসটির মান : সহীহ

গ. হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট শুনেছি, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন পাঁচ ওয়াক্তের নামাযসমূহ এরূপ নিয়ে আসবে, যাতে সময়ের প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে, উত্তমরূপে ওজু করা হয়েছে এবং খুশু খুজুর সহিত পড়া হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ওয়াদা করেছেন যে তাকে আজাব দেওয় হবে না। আর যে ব্যক্তি এরূপ নামায নিয়ে আসবে না, তার জন্য আল্লাহ তা'আলার কোনো ওয়াদা নেই। ইচ্ছা করলে তিনি নিজ রহমতগুণে মাফ করে দেবেন অথবা আজাব দেবেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ :مَنْ سَمِعَ هَذَا مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَاللَّهِ مَا بَعْدَ الْعَهْدُ، وَمَا نَسِيتُ، إِنَّمَا قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ جَاءَ بِصَلَوَاتِ الْخَمْسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَدْ حَافَظَ عَلَى وُضُوئِهَا، وَمَوَاقِيتِهَا وَرُكُوعِهَا، وَسُجُودِهَا، لَمْ يُنْقِصْ مِنْهَا شَيْئًا، جَاءَ وَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُ، وَمَنْ جَاءَ وَقَدِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ رَحِمَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

(আল মুজামুল আওসাত ৪/৩৯৩ হা. ৪০১২)
হাদীসটির মান : সহীহ লি শাওয়াহিদিহী।

ঘ. অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কেরামের নিকট তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, তোমরা কি জানো আল্লাহ তা'আলা কী বলেছেন? সাহাবায়ে কেরাম (রা.) উত্তর দিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। অধিক গুরুত্ব বোঝানোর জন্য তিনি একই প্রশ্ন তিনবার করলেন এবং সাহাবীগণ একই উত্তর দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তা'আলা আপন ইজ্জত ও বড়ত্বের কসম করে বলছেন, যে ব্যক্তি সময়ের প্রতি লক্ষ রেখে এই সকল নামায পড়তে থাকবে আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি তা করবে না ইচ্ছা করলে তাকে নিজ রহমতে ক্ষমা করব, না হয় আজাব দেব।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْحَرَشِيُّ، ثنا الْفَضْلُ الْأَغَرُّ الْكِلَابِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى أَصْحَابِهِ يَوْمًا فَقَالَ لَهُمْ :هَلْ تَدْرُونَ مَا يَقُولُ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالُوا :اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ :وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا يُصَلِّيهَا عَبْدٌ لِوَقْتِهَا إِلَّا أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا إِنْ شِئْتُ رَحِمْتُهُ، وَإِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ :خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ سَبْعَةٌ :مِنَّا ثَلَاثَةٌ مِنْ عَرَبِنَا، وَأَرْبَعَةٌ مِنْ مَوَالِينَا -أَوْ أَرْبَعَةٌ مِنْ عَرَبِنَا وَثَلَاثَةٌ مِنْ مَوَالِينَا -قَالَ :فَخَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا، فَقَالَ :مَا يُجْلِسُكُمْ هَاهُنَا؟ قُلْنَا :انْتِظَارُ الصَّلَاةِ، قَالَ :فَنَكَتَ بِإِصْبَعِهِ فِي الْأَرْضِ، وَنَكَسَ سَاعَةً .ثُمَّ رَفَعَ إِلَيْنَا رَأْسَهُ فَقَالَ :هَلْ تَدْرُونَ مَا يَقُولُ رَبُّكُمْ؟ قَالَ :قُلْنَا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .قَالَ: "إِنَّهُ يَقُولُ :مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَأَقَامَ حَدَّهَا، كَانَ لَهُ بِهِ عَلَيَّ عَهْدٌ أُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَلَمْ يُقِمْ حَدَّهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدِي عَهْدٌ، إِنْ شِئْتُ أَدْخَلْتُهُ النَّارَ، وَإِنْ شِئْتُ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ (تعليق المحقق) إسناده جيد

(আল মুজামুল কাবীর [তাবারানী ১০/২৮১ হা. ১০৫৫৫, সুনানুদ দারামী ২/৭৮১ হা. ১২৬২)
হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

উভয় জাহানে সফলতার নীতিমালা :

পবিত্র কোরআনে উভয় জাহানে সফলতা ও কামিয়াবীর নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো অহেতুক কথা থেকে বেঁচে থাকা।

الذين هم عن اللغو معروضون

যারা অহেতুক কথা থেকে বেঁচে থাকে।

অহেতুক কথার অর্থ হলো যার মধ্যে দুনিয়াবী কোনো উপকার নেই আবার দ্বীনি কোনো লাভও নেই। যেমন মানুষ নিজের ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা নিয়ে খুব চিন্তা-ফিকির করে নিজের জরুরতে খরচ করে। কোনো লোক টাকা খরচ করে অহেতুক জিনিস নেয় না। যারা এরূপ করবে তাদের বেকুব বলা হয়। তেমনি মানুষের জীবন এবং সময়ও সম্পদ। বরং জাগতিক সম্পদ থেকে মূল্যবান। টাকা-পয়সা তো আসে আর যায়। ধন-সম্পদ নষ্ট হওয়ার পর আবার পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু জীবন এবং সময় যদি অহেতুক নষ্ট হয়, অনর্থক কাজে ব্যয় হয় তবে ব্যয়িত সময় আর ফিরে আসবে না। টাকা খরচ করার সময় যেমন দেখা হয় এর বদলাতে কী পাওয়া যাচ্ছে। তেমনি সময় ব্যয় করার ক্ষেত্রে দেখতে হবে কোন কাজে ব্যয় হচেছ। এর বদলাতে কী আয় করা হচ্ছে। যদি এরূপ চিন্তা-ভাবনা থাকে তবে মুক্তি ও কামিয়াবী অর্জন সহজ হয়ে যাবে। বিশেষ করে কথা বলার ক্ষেত্রে বেশি বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। বরং চুপ থাকাতেই উপকার বেশি। হাদীস শরীফে এসেছে–

من صمت نجا যে চুপ থাকল সে নাজাত পেল।

যেখানে কথা বলার প্রয়োজন, সেখানে জরুরতমাফিক কথা বলা উচিত। জনৈক অন্ধ লোক আসছে। তার সামনে একটি বড় গর্ত। তখন যদি আমরা তাকে অবহিত না করি তবে সে গর্তে পড়ার সম্ভাবনা। এরূপ ক্ষেত্রে বলা জরুরি। প্রয়োজন ছাড়া কথা না বলা বরং চুপ থাকা।

বুযুর্গরা মর্যাদা হিসেবে সম্মান করে থাকেন :

একদা এক সফরে কিছু লোকের সাথে সাক্ষাৎ হলো। লোকেরা বুযুর্গদের কথা বলছিল। অমুক বুযুর্গের কাছে গিয়েছিলাম। সেখানে এরূপ ব্যবস্থাপনা দেখলাম। অমুক বুযুর্গের দরবারে গিয়েছি। সেখানে আগত মেহমানদের জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে। চা-নাশতা, খানাপিনা সব কিছুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু থানাভন গেলাম সেখানে কিছুই পেলাম না। কেউ চায়ের কথাও বলেনি। তার কথা শেষ হওয়ার পর আমি বললাম, আমি কি কিছু বলতে পারি? তাঁরা কয়েকজন ছিলেন। বললেন–নিশ্চয়ই, বলেন। আমি বললাম, আপনারা কি ডাকঘরে গিয়েছেন। তাঁরা বললেন, সময় সময় যেতে হয়। আচ্ছা বলুন তো, সেখানে কি কেউ চায়ের কথা জিজ্ঞেস করেছে? বললেন, না। অমুক মার্কেটে গিয়েছেন? বললেন, হ্যাঁ। সেখানে কি তারা আপনাদের চায়ের জন্য বলেছে? বললেন, না। আমি বললাম, আপনারা তো এসবের কথা বললেন না যে, ওখানে ওখানে যাওয়া হয়েছে। কেউ চায়ের কথাও জিজ্ঞেস করেনি। শুধু থানাভনের কথা কেন বললেন? আসলে বর্তমানে আমরা সব ক্ষেত্রে বুযুর্গদের মধ্যে তুলনা করতে চাই। একেকজনের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে সামঞ্জস্য করতে চাই। এসব ঠিক না।

বুযুর্গদের কাছে মানুষ দুই ভাবে যায়। একটা হলো বন্ধুত্ব ও মেহমান হিসেবে। আরেকটা হলো আত্মসংশোধন ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসার জন্য যাওয়া। যে উদ্দেশ্যে যাবে সেই হিসেবে তার সাথে আচরণ করা হয়। এখন প্রত্যেকে যদি নিজের মর্যাদা হিসেবে সেখানে আচরণ পেতে চান, কিভাবে সম্ভব? ডাক্তারের কাছে যান চিকিৎসার জন্য। তখন ডাক্তার সাহেবের দায়িত্বের বেলায় কি আপনাকে দাওয়াত খাওয়ানো, চা পান করানো ইত্যাদি চিন্তা করেন? বরং সেখানে তো ডাক্তারের ফিও দেন আবার পৃথকভাবে ওষুধের টাকাও প্রদান করেন। এরপর ডাক্তার সাহেবের শুকরিয়াও আদায় করেন। আবার যখন আধ্যাত্মিক চিকিৎসার জন্য আসেন তখন চেয়ে বসেন খানাপিনাও থাকবে, চা পানেরও ব্যবস্থা থাকবে। যদি না হয় তবে বিভিন্ন প্রশ্ন জুড়ে দেন। অথচ কিছু বলতে পারবেন তখনই, যখন সেখানে আপনার প্রাপ্য আদায়ের ব্যাপারে কোনো কমতি থাকে। অথচ ডাক্তারের কাছে যে অবস্থান, এখানেও সেই একই বিষয়। এর মধ্যেও যদি কেউ খানাপিনার ব্যবস্থা করে, চা-নাশতার আয়োজন করে তবে তা তো ওই ব্যক্তির অনুগ্রহ, যা তার আবশ্যকীয় দায়িত্ব নয়। সুতরাং এরূপ বিষয়ে প্রশ্ন তো দূরের কথা বরং আলোচনা করাও অহেতুক।

ইফাদাতে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

মধ্যপন্থাই কাম্য

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) বলেন, খাল-বিল, নদী-নালার জোয়ার-ভাটার ন্যায় মানুষের মধ্যেও ইবাদত-বন্দেগীর জোয়ার-ভাটার প্রবণতা অতিমাত্রায় লক্ষণীয়। নদী-নালায় তীব্র জোয়ার কাম্য নয়। কারণ এর দ্বারা মানুষ বিভিন্ন ধরনের ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। অতিমাত্রায় ভাটাও কাম্য নয়, কারণ এতে করে নদী-নালা মরে মরুভূমির রূপ ধারণ করে। আর এটা চরম ক্ষতির কারণ নিজের এবং অন্যের। ইবাদত-বন্দেগীর বিষয়েও কেউ افراط তথা অতি বাড়াবাড়ির শিকার যে অন্যের হক নষ্ট হলেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কখনো অতি বাড়াবাড়ি করে একসময় বিরক্ত হয়ে ছাড়াছাড়ির পথ ধরে। দুটির কোনোটাই কাম্য নয়। আবার ক্ষতিকরও বটে। কেউ কেউ تفريط তথা শিথিলতার শিকার। ইবাদতের প্রতি বিলকুল উদাসীন, আগ্রহ নেই, মনোযোগ নেই। অবজ্ঞা, অবহেলা তো চোখে পড়ার মতো। অনেকে আছে, ইবাদতের প্রয়োজনও বোধ করে না। নিঃসন্দেহে এটিও ক্ষতিকর। শুধু ইবাদত-বন্দেগীই নয়, পার্থিব যেকোনো বিষয়েই افراط বাড়াবাড়ি, সীমালংঘন এবং تفريط অতিমাত্রায় শিথিলতা নিন্দনীয়। রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। সর্বক্ষেত্রে اعتدال মধ্যপন্থা অবলম্বন প্রশংসনীয়। যেখানে নেই বাড়াবাড়ি, সীমালংঘন, নেই কোনো ধরনের শিথিলতা অবহেলা ও অবজ্ঞা। ভালো করে মনে রাখবেন, কোনো আমল নিয়মিত করা, করতে বলা বা বাতিলের সাথে আপস না করার নাম বাড়াবাড়ি নয়। বরং এটাই রাসূল (সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ এবং উম্মতের প্রতি নির্দেশও বটে।

ইহুদিবাদের অধ্যয়নে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে তারা ইবাদত-বন্দেগী ও আখেরাতের প্রতি চরম উদাসীন। দুনিয়ার প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত ও লোভী। তাদেরকে পবিত্র কোরআনে এভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

(বরং) নিশ্চয়ই তুমি বেঁচে থাকার প্রতি তাদেরকে অন্যান্য মানুষ অপেক্ষা বেশি লোভাতুর পাবে–এমনকি মুশরিকদের চেয়েও বেশি। তাদের একেকজন কামনা করে যদি এক হাজার বছর আয়ু লাভ করত, অথচ দীর্ঘায়ু লাভ তাকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আর তারা যা কিছুই করছে আল্লাহ তা ভালোভাবে দেখছেন। (বাকারা ৯৬)

ইবাদতের প্রতি তাদের উদাসীনতার কথা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

তারপর তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো এমন লোক, যারা নামায নষ্ট করল এবং ইন্দ্রিয় চাহিদার অনুগামী হলো। সুতরাং তারা অচিরেই তাদের পথভ্রষ্টতার সম্মুখীন হবে। (মরিয়াম ৫৯)

আরো ইরশাদ হচ্ছে–

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا

আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দিতে চান আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুগমন করে, তারা চায় তোমরা যেন সঠিক পথ থেকে বহু দূরে সরে যাও। (নিসা ২৭)

খ্রিস্টবাদের অধ্যয়নে কিছু বিষয়ে সম্পূর্ণ উল্টো চিত্র ফুটে ওঠে। তারা আখেরাত সাজানোর আশায় ইবাদতের নামে বৈরাগ্যবাদের

فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

রমাযান মাস–যে মাসে কোরআন নাযিল করা হয়েছে, যা আদ্যোপান্ত হেদায়াত এবং এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলিসম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে সে যেন এ সময় অবশ্যই রোযা রাখে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয় বা সফরে থাকে, তবে অন্য সময় সে সমান সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের পক্ষে যা সহজ সেটাই করতে চান, তোমাদের জন্য জটিলতা সৃষ্টি করতে চান না, যাতে তোমরা রোযার সংখ্যা পূরণ করে নাও এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে পথ দেখিয়েছেন, সে জন্য আল্লাহর তাকবীর পাঠ করো এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। (বাকারা ১৮৫)

৩। আরো ইরশাদ হচ্ছে–

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى

মনগড়া বিধান রচনা করে। একসময় তারা দেহ ও মনকে কষ্ট দেওয়াকেই ইবাদত বলে আখ্যায়িত করে। তাদের ব্যাপারে কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

অতঃপর আমি তাদেরই পদাঙ্কনুসারী করে পাঠাই আমার রাসূলগণকে এবং তাদের পেছনে পাঠালাম ঈসা ইবনে মারইয়ামকে। আর তাঁকে দান করলাম ইনজিল। যারা তাঁর অনুসরণ করল আমি তাদের অন্তরে দিলাম মমতা ও দয়া। আর রাহবানিয়্যাতের যে বিষয়টা, তা তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছিল। আমি তাদের ওপর তা বাধ্যতামূলক করিনি। বস্তুত তারা (এর মাধ্যমে) আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান করতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আমি তাদের প্রতিদান দিয়েছিলাম। আর তাদের বহুসংখ্যক হয়ে থাকল অবাধ্য। (হাদীস ২৭)

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের দুটি বিষয়ের নিন্দা করেছেন। ১। মনগড়া বিধান রচনা করার, যা বিদ'আত হিসেবে চিহ্নিত। ২। তাদের রচিত বিধান পালনে ব্যর্থতার।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল تفريط ও افراط উভয়টি শরীয়তে নিন্দনীয়। افراط বাড়াবাড়ি মানুষকে লক্ষ্যচ্যুত করে আর تفريط শিথিলতার কারণে মানুষ আল্লাহ ও ইনসাফবিমুখ হয়ে যায়। ইমাম আওযাঈ (রহ.)-এর উক্তিই যথার্থ–

مامن امر امر الله به الا عارضه الشيطان بخصلتين، لايبالى ايهما اصاب الغلو والتقصير

আল্লাহর প্রতিটি বিধানের মোকাবেলায় শয়তান দুটি পথ অবলম্বন করে, কোনটি কাজে আসবে এটার পরোয়া সে করে না। এক. غلو তথা সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি। দুই . تقصير তথা শিথিলতা।

বোঝা গেল, যারা تفريط ও افراط এর শিকার তারা মূলত শয়তানের ফাঁদে পড়েছে, তার জালে আটকা পড়েছে। এ কারণেই ইসলামে রাহে ইতেদাল অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ মর্মে কিছু আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা হলো।

১। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا

(কৃপণতাবশে) নিজের হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখো না এবং (অপব্যয়ী হয়ে) তা সম্পূর্ণরূপে খুলে রেখো না, যদ্দরুন তোমাকে নিন্দাযোগ্য ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়তে হবে। (ইসরা ২৯)

২। আরো ইরশাদ হচ্ছে–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

الْقَوْمِ الْكَافِرِين

আল্লাহ কারো ওপর তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ করেন না। তার উপকার লাভ হবে সে কাজেই যা সে স্বেচ্ছায় করে এবং তার ক্ষতিও হবে সে কাজেই যা সে স্বেচ্ছায় করে। হে মুসলিমগণ! (তোমরা আল্লাহর কাছে এই দু'আ করো যে) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দ্বারা যদি কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তবে সে জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রতি সেই রকমের দায়িত্ব অর্পণ করো না, যে রকম ভার অর্পণ করেছিলে আমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ওপর এমন ভার চাপিয়ো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের ত্রুটিসমূহ মার্জনা করো, আমাদের ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি দয়া করো। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো। (বাকারা ২৮৬)

৪। ইরশাদ হচ্ছে–

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى

আমি তোমাদের প্রতি কোরআন এ জন্য নাযিল করিনি যে তুমি কষ্ট ভোগ করবে। (তোয়াহা ২)

৫। ইরশাদ হচ্ছে–

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

হে মুসলিমগণ! এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা অন্যান্য লোক সম্পর্কে সাক্ষী হও এবং রাসূল হন তোমাদের পক্ষে সাক্ষী। পূর্বে তোমরা যে কিবলার অনুসারী ছিলে, আমি তা অন্য কোনো কারণে নয় বরং কেবল এ কারণেই স্থির করেছিলাম যে, আমি দেখতে চাই কে রাসূলের আদেশ মানে আর কে তাঁর পেছন দিকে ঘুরে যায়। সন্দেহ নেই এ বিষয়টা বড় কঠিন ছিল, তবে আল্লাহ যাদেরকে হেদায়াত দিয়েছিলেন, সেই সকল লোকের পক্ষে মোটেও কঠিন ছিল না। আর আল্লাহ এমন নন যে তিনি তোমাদের ঈমান নিষ্ফল করে দেবেন। আল্লাহ মানুষের প্রতি অতি মানবতাপরায়ণ, পরম দয়ালু। (বাকারা ১৪৩)

৬। ইরশাদ হচ্ছে–

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করো, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে (তাঁর দ্বীনের জন্য) মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। নিজেদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো। সে পূর্বেও তোমাদের নাম রেখেছিল মুসলিম এবং এ কিতাবেও, যাতে এই রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হতে পারেন আর তোমরা সাক্ষী হতে পারো অন্যান্য মানুষের জন্য। সুতরাং নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো। তিনি তোমাদের অভিভাবক। দেখো কত উত্তম অভিভাবক তিনি এবং কত উত্তম সাহায্যকারী। (হজ ৭৮)

৭। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

আল্লাহ তোমাকে যা কিছু দিয়েছেন তার মাধ্যমে আখেরাতের নিবাস লাভের চেষ্টা করো এবং দুনিয়া হতেও নিজ হিস্যা অগ্রাহ্য করো না। আল্লাহ যেমন তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি তুমিও (অন্যদের) প্রতি অনুগ্রহ করো। আর পৃথিবীতে ফ্যাসাদ বিস্তারের চেষ্টা করো না। নিশ্চিত জেনো আল্লাহ ফ্যাসাদ বিস্তারকারীদের পছন্দ করেন না। (কাসাস ৭৭)

৮। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

وَالقَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا

সর্ব বিষয়ে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো। (বোখারী শরীফ, হা. ৬৪৬৩)

৯। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

وَأَنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

কম হলেও যে আমল নিয়মিত করা

হয় তা আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়। (বোখারী শরীফ, হা. ৬৪৬৪)

১০। আরো ইরশাদ করেন–

اكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ

তোমরা সামর্থ্যানুযায়ী আমল করো। (বোখারী শরীফ, হা. ৬৪৬৫)

১১। তিনি আরো বলেন–

فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

আমি তোমাদেরকে কিছু নির্দেশ করলে তোমরা ততটুকুই বাস্তবায়ন করো যতটুকু তোমাদের সামর্থ্যের মধ্যে। (মুসলিম শরীফ, হা. [১৩৩৭] ৪১২ বোখারী শরীফ, হা. ৭২৮৮)

১২। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

لَا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

তোমরা নিজেদের ব্যাপারে কঠিন পথ অবলম্বন করো না। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ওপর কঠোরতা করবেন। (আবু দাউদ শরীফ, হা. ৪৯০৪)

১৩। হাদীসে বর্ণিত আছে, এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে এসে বললেন,

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلاَنٌ فِيهَا، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْضِعٍ كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ :يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالكَبِيرَ وَذَا الحَاجَةِ

আমি ফজরের নামাযের জামাতে অংশগ্রহণ করি না। ইমাম সাহেবের কেরাত লম্বা করার কারণে। বর্ণনাকারী আবু মাসউদ আনসারী (রা.) বলেন, সেদিনের বক্তব্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) যে পরিমাণ রাগান্বিত হয়েছিলেন তাঁকে এত রাগান্বিত হতে আমি কখনো দেখিনি। তিনি বক্তব্যে বলেন, তোমাদের কেউ কেউ অন্যদের ইবাদত বিমুখ করে। তোমাদের যে কেউ ইমামতি করবে সে যেন কেরাত ছোট করে। কারণ তার ইকতিদাকারীদের মধ্যে বয়স্ক, দুর্বল এবং তাড়া আছে এমন লোকও থাকে। (বোখারী শরীফ, হা. ৭০৪, মুসলিম শরীফ হা. [৪৬৬] ১৮২)

১৪। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ :دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَقَالَ :مَا هَذَا الحَبْلُ؟ قَالُوا :هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا حُلُّوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ

একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদে প্রবেশ করে মসজিদের দুটি খুঁটির মধ্যবর্তী স্থানে একটি রশি বাঁধা দেখে জিজ্ঞেস করেন, এখানে রশি বাঁধা কেন? উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বলেন, এটা হযরত যয়নবের রশি। তিনি নামায পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে গেলে এই রশির সাথে ঝুলে নামায আদায় করতে থাকেন। এ কথা শুনে রাসূল (সা.) বলেন, এই রশি খুলে ফেলো। আর মনে রেখো, যতক্ষণ আগ্রহ থাকবে তোমরা ততক্ষণই নামায আদায় করবে, যখন ক্লান্ত হয়ে যাবে তখন ঘুমিয়ে যাবে। (বোখারী শরীফ, হা. ১১৫০)

১৫। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

আমার মধ্যে আল্লাহর ডর ভয় তোমাদের চেয়ে বেশি। তার পরও আমি কোনো দিন রোযা রাখি, কোনো দিন রাখি না। রাতের কিছু অংশ নামাযে কাটাই, কিছু অংশ ঘুমাই। আবার আমি স্ত্রী নিয়ে ঘর-সংসারও করি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার পথ ও আদর্শ (সর্ব বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন) থেকে বিরাগভাজন হবে সে আমার অনুসারী নয়। (বোখারী শরীফ, হা. ৫০৬৩)

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল শরীয়তে افراط ও تفريط নিষিদ্ধ নিন্দনীয়। আর اعتدال ও توسط প্রশংসনীয়, বরণীয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রাহে ইতিদালে পরিচালিত করুন। আমীন।

বিন্যাস ও গ্রন্থনা :
মুফতী নূর মুহাম্মদ

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

দুরূদ, সালাম ও প্রচলিত মীলাদের শরঈ বিধান

শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক্ব

দুরূদ ও সালামের গুরুত্ব

১। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দুরূদ ও সালাম পাঠ করার জন্য সকল ঈমানদারকে আহবান জানিয়েছেন।

২। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "তোমরা আমার ওপর দুরূদ পাঠ করো তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছানো হয়।"

৩। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার ওপর দুরূদ পড়া থেকে ভুলে থাকল, সে বেহেশতের রাস্তা থেকে হটে গেল।" (ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৯০৮, বাইহাকী শু'আবুল ঈমান, হাদীস নং-১৪৭২)

দুরূদ ও সালামের ফজীলত

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

"কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটে থাকবে, যে আমার ওপর বেশি বেশি দুরূদ পাঠ করবে।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তা'আলা বহুসংখ্যক ফেরেশতা এ কাজের জন্য নিয়োগ দিয়েছেন যে তারা পৃথিবীর জমিনে বিচরণ করতে থাকবে এবং আমার উম্মতের যে ব্যক্তি আমার জন্য দুরূদ ও সালাম পাঠাবে তারা তা আমার নিকট পৌঁছে দেবে।" (শু'আবুল ঈমান, বাইহাকী হাদীস নং-১৪৮২, নাসাঈ হাদীস নং-১২৮০)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, ফেরেশতাগণ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট প্রেরণকারীর নাম উল্লেখ করে তার দুরূদ ও সালাম পেশ করে থাকেন।

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সকালে আমার ওপর দশবার দুরূদ পাঠ করবে এবং সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ পাঠ করবে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব। (তবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/১২০)

দুরূদ ও সালাম সম্পর্কীয় মাসায়েল

কোরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের কারণে সারা জীবনে কমপক্ষে একবার দুরূদ পাঠ করা ফরযে আইন। (দুররে মুখতার ১/৫১৪)

যদি একই মজলিসে কয়েকবার নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম আলোচিত হয়, তাহলে প্রথমবার সকলের জন্য দুরূদ পাঠ করা ওয়াজিব, পরবর্তী প্রতিবার নির্ভরযোগ্য মতানুসারে সকলের জন্য মুস্তাহাব। অবশ্য ইমাম ত্বহাবী (রহ.) পরবর্তী প্রতিবারও সকলের জন্য দুরূদ পাঠ করা ওয়াজিব বলেছেন। (দুররে মুখতার ১/৫১৬)

কেউ যদি নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম মুবারক একই মজলিসে বারবার লেখেন, তাহলে তার হুকুমও অনুরূপ, অর্থাৎ প্রথমবার দুরূদ লেখা ওয়াজিব, পরবর্তীবার লেখা মুস্তাহাব। (দুররে মুখতার ১/৫১৬)

বিনা ওজুতে, শুয়ে-বসে, হাঁটাচলা –সর্বাবস্থায় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দুরূদ পড়া যায়।

জুমু'আ বা ঈদের খুতবায় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম এলে অন্তরে অন্তরে দুরূদ পড়বে, মুখে উচ্চারণ করবে না।

দুররে মুখতার কিতাবে উল্লেখ আছে, দুরূদ শরীফ পড়ার নিয়ম হলো, দিলে অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে ধীরস্থিরভাবে হালকা আওয়াজে চুপে চুপে পড়বে। দুরূদ শরীফ পড়ার সময় ঢুলতে থাকা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হেলাতে থাকা এবং উঁচু আওয়াজ করা উচিত নয়। (দুররে মুখতার ১/৫১৯)

নতুন ঘরবাড়ি, দোকান, অফিস ইত্যাদি উদ্বোধনের ক্ষেত্রে করণীয় :

দুররে মুখতার কিতাবে আরো উল্লেখ আছে, দুরূদ শরীফ যথাস্থানে পড়বে। যেটা দুরূদ পড়ার কোনো স্থান নয় বরং দুনিয়াবী কোনো উদ্দেশ্য সামনে আছে, এমন স্থানে দুরূদ পড়ার রসম বানানো বা দুরূদ পড়ার জন্য লোকদের দাওয়াত দেওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। যেমন : নতুন ঘরবাড়ি, দোকান ইত্যাদি উদ্বোধন করার সময়। এ ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, দুই

রাক'আত শুকরিয়ার নামায পড়া বা হক্কানী আলেম দ্বারা বয়ানের ব্যবস্থা করা। (দুররে মুখতার ১/৫১৮)

দুরূদ শরীফ পড়ার স্থান হলো, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রওজা শরীফ জিয়ারতের সময়, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম বলা বা শোনার সময়, মসজিদে প্রবেশের সময় ও বের হওয়ার সময়, কোনো মজলিস থেকে ওঠার সময়, দু'আ বা মুনাজাতের আগে এবং পরে। আযানের পর দু'আর আগে, ওজুর শেষে, কিতাব বা চিঠিপত্র বা অন্য কিছু লেখার পূর্বে। বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। কোনো প্রথা পালন না করে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শাফায়াত পাওয়ার আশায় বেশি বেশি দুরূদ পড়া। (দুররে মুখতার ১/৫১৬, আল কাউলুল বাদী, পৃ. ৩১৮)

সহীহ মীলাদের পদ্ধতি

আমরা মুসলমান, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মাত, পৃথিবীর সব কিছু থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুহাব্বত এবং ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি। এটা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শানে সহীহ তরীকায় মীলাদ পড়া আমাদের কর্তব্য। হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) "ইসলাহুর রুসূম" গ্রন্থে মীলাদের সহীহ পদ্ধতি লিখেছেন, প্রচলিত মীলাদের সাথে সামঞ্জস্যতা না রেখে; দিন, তারিখ, সময়, পূর্ব থেকে নির্ধারিত না করে, ডাকাডাকি ছাড়া ঘটনাচক্রে কিছু লোক একত্রিত হয়ে গেল বা কোনো প্রয়োজনীয় কাজে বা বয়ানের জন্য লোকদের একত্রিত করা হয়েছিল, তখন উপস্থিত লোকদের সামনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত তরীকা এবং জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করা, এরপর কোরআন থেকে কিছু সূরা পড়ে অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে হালকা আওয়াজে একাকী দুরূদ শরীফ পড়বে। অন্যের সাথে তাল মিলিয়ে সমষ্টিগতভাবে এক আওয়াজে পড়বে না। মীলাদে ইয়া নবী, ইয়া রাসূল, ইয়া হাবীব ইত্যাদি কিছুই পড়বে না, তাওয়ালুদ করবে না, কিয়াম করবে না। কেননা এসবের কোনো ভিত্তি শরীয়তে নেই।

উল্লেখ্য, নির্ভরযোগ্য কোনো কোনো কিতাবে মীলাদের কথা পাওয়া যায়, তার দ্বারা উদ্দেশ্য এই সহীহ তরীকার মীলাদ যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতের আলোচনা হয় এবং সহীহ দুরূদ পড়া হয়। প্রচলিত গলদ মীলাদ কোনো অবস্থায় তাদের উদ্দেশ্য নয় এবং তারা কেউ এ গলদ মীলাদ পড়তেন না।

সমাজে যেভাবে মীলাদ-কিয়ামের প্রচলন রয়েছে

যেখানে একজন আলেম সাহেব তাওয়ালুদ পড়েন এবং কবিতা পাঠ করতে থাকেন, ফাঁকে ফাঁকে সকলে একসাথে দুরূদ পড়েন, এর মধ্যে হঠাৎ দাঁড়িয়ে বা বসে 'ইয়া নবী সালামালাইকা', 'ইয়া রাসূল সালামালাইকা', 'ইয়া হাবীব সালামালাইকা' এরূপ দুরূদ পড়েন, এর কোনো দলিল কোরআন-হাদীসে নেই। এগুলো সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং মনগড়া, তাই এর থেকে মুসলমানদের বিরত থাকা কর্তব্য। (সূরা আনআম-৫৯, সূরা নামল-৬৫, তাফসীরে কুরতুবী-১২/৩২২, নাসাঈ শরীফ-১২৮২, ফাতাওয়া কাযিখান-১/৩৩৪, আহসানুল ফাতাওয়া-১/৩৪৮)

উল্লেখ্য, তাওয়ালুদ নামে যা পড়া হয় এটা কোরআন-হাদীসে নেই। তারপর আরবী-ফার্সি-বাংলা কবিতা পড়া হয়, তাও শরীয়তে নেই, তার অর্থও ভুল। "ইয়া নবী" ওয়ালা যে দুরূদ পড়া হয় তাও হাদীসের কোনো কিতাবে নেই এবং আরবী গ্রামারের দিক দিয়ে তা ভুল, তার অর্থও ভুল। তারপর নামাযের দিকে খেয়াল করলে দেখা যায় বসে দুরূদ শরীফ পড়া উত্তম আর এখানে সেটা বাদ দিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া হয়, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ জীবদ্দশায় পছন্দ করেননি বরং নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ)

যেহেতু আমাদের সমাজে এ মীলাদ-কিয়াম নিয়ে বহু দিন থেকে বাগ্‌বিতণ্ডা, তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে, দেশের হক্কানী উলামায়ে কেরাম এটাকে নাজায়েয বললেও সাধারণ মানুষ এটাকে বিদ'আত বলতে রাজি নয়, এর মূল কারণ হলো, মীলাদ-কিয়ামের সমর্থকরা এ সম্পর্কে প্রকৃত ইতিহাস জানেন না।

তাই মীলাদের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো, যাতে সকলে এর প্রকৃত ইতিহাস জেনে এর থেকে বিরত থাকতে পারে।

মীলাদের ইতিহাস

প্রচলিত মীলাদের সূচনা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে, তাবেঈনএবং তাবেতাবেঈনের সময়ে বর্তমানে প্রচলিত পন্থায় মীলাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ইসলামের সূচনাকাল থেকে সুদীর্ঘ ছয় শ বছর পর্যন্ত এই মীলাদের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে মীলাদ সমর্থক এবং মীলাদবিরোধী সকলেই একমত। সর্বপ্রথম ৬০৪ হিজরী থেকে আজকের প্রচলিত মীলাদের যাত্রা শুরু হয়। এই মীলাদের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক মৌলভী আব্দুস সামী 'আনওয়ার সাতিয়াতে' এ কথা স্বীকার করেছেন। চিত্তবিনোদনের জন্য এই মীলাদের আয়োজন করা হয়,

বিশেষভাবে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখকে নির্দিষ্ট করে মীলাদ করার প্রচলন আগে ছিল না। এই প্রথা এসেছে হিজরী ৬০৪-এর শেষের দিকে। (বারাহীনে কাতেআহ, পৃ. ১০৩, তারিখে মীলাদ পৃ. ১৩)

মূলকথা হলো, প্রচলিত মীলাদের আবিষ্কার হিজরী ছয় শতকের পরে হয়েছে। (ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া, পৃ. ১১৪)

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ২৩ বছর নবুওয়াতের যুগে, এরপর ১১ হিজরী থেকে চল্লিশ হিজরীর ১৭ রমযান আনুমানিক ত্রিশ বছর খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগ। এরপর কমবেশি ১২০ হিজরী সাহাবায়ে কেরামের শেষ যুগ। এরপর কমবেশি ২২০ হিজরী পর্যন্ত তাবেঈন, তাবেতাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের যুগ। এরপর ৪০০ হিজরী পর্যন্ত ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনের যুগ, অতঃপর আরো ৬০৩ হিজরী পর্যন্ত তৎকালীন উলামায়ে কেরামের যুগেও এই প্রচলিত মীলাদের অস্তিত্ব ছিল না। সর্বপ্রথম ৬০৪ হিজরী মোতাবেক ১২১৩ খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রচলিত মীলাদের প্রচলন শুরু হয়। সুতরাং প্রচলিত মীলাদ নিঃসন্দেহে বিদ'আত এবং নাজায়েয, যার কোনো ভিত্তি শরীয়তে নেই।

প্রচলিত মীলাদের আবিষ্কারক :

মীলাদ যাঁরা সমর্থন করেন এবং যাঁরা এর বিরোধিতা করেন, তাঁদের সকলেই এ বিষয়ে একমত যে হিজরী ছয় শতকে ইরাকের মসূল এলাকায় উমর বিন মুহাম্মাদ মসূলী এই প্রচলিত মীলাদের আবিষ্কার করেন। (তারিখে মীলাদ, পৃ. ১৫)

মৌলভী আব্দুল হক মুহাজেরে মক্কী (রহ.)-এর লেখা কিতাব 'আদ দুররুল মুনাযযাম ফী হুকমি আমালি মাওলিদিন নাবিয়্যিল আযাম' পৃ. ১৬০-এ মুফতী সা'দুল্লাহ সাহেব বলেন, প্রচলিত মীলাদ রবিউল আউয়াল মাসে দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করে সম্পাদন করার নিয়ম সর্বপ্রথম ইরাকের মসূল শহরে হয়েছে। এখানে উমর বিন মুহাম্মাদ সর্বপ্রথম এই মীলাদের আবিষ্কার করেন। (তারিখে মীলাদ, পৃ. ১৬)

মৌলভী মুহাম্মাদ আযম সাহেব লিখেন, জানা দরকার যে এই পবিত্র মীলাদের আবিষ্কারক হযরত শায়খ উমর বিন মুহাম্মাদ মসূলী। (ফাতহুল ওয়াদূদ, পৃ. ৮-এর সূত্রে তারিখে মীলাদ, পৃ. ১৬)

প্রচলিত মীলাদ সমর্থক জনাব মৌলভী আব্দুস সামী সাহেব লিখেন, সর্বপ্রথম এই প্রচলিত মীলাদ ইরাকের মসূল শহরে শায়খ উমর আবিষ্কার করেন। (আনওয়ারে সাতিহা সূত্রে বারাহীনে কাতেআহ, পৃ. ১৬৪)

সারকথা হলো, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের ছয় শত বছর পর্যন্ত এই মীলাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। হিজরী ৬০৪ সালে সর্বপ্রথম শায়খ উমর ইরাকের মসূল শহরে এই মীলাদের আবিষ্কার করেন। আর তার অনুসরণ করেছিলেন বাদশাহ আরবীল আবূ সাঈদ কাওকারী, তিনিই মূলত এই মীলাদের প্রসার করে ছিলেন। (বারাহীনে কাতেআহ, পৃ. ১৬৩-৬৪)

আবিষ্কারক কেমন ছিলেন?

প্রচলিত মীলাদের আবিষ্কারক উমর বিন মুহাম্মাদ মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস বা ফকীহ কিছুই ছিলেন না। ইলম ও সম্মানের দিক দিয়ে তিনি একজন অখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পরিচিতি মূলত বাদশাহ আরবীলের মাধ্যমেই হয়েছে। অনেক বিজ্ঞ আলেম ও মহামনীষী তীব্র ও কঠিন ভাষায় তাঁর সমালোচনা করেছেন। যেমন : আল্লামা তাজুদ্দীন ফাকেহানী বলেন, প্রচলিত মীলাদ আবিষ্কার করেছে ভ্রষ্ট ও চিত্তপূজারী লোকেরা এবং পেটপূজারী লোকেরা এর ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। (তারিখে মীলাদ, পৃ. ১৮)

প্রচলিত মীলাদ সর্বপ্রথম শায়খ উমর এবং বাদশাহ আরবীল আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা দুজনেই বিজ্ঞ আলেমদের কাছে অবিশ্বাসযোগ্য এবং অগ্রহণীয় ছিলেন। কারণ তাঁরা উভয়েই গানবাদ্য বাজাতেন। (তাওযীহুল মারাম ফী বায়ানিল মাওলিদি ওয়াল কিয়াম সূত্রে তারিখে মীলাদ, পৃ. ১৮)

ওপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে জানা গেল যে মীলাদের আবিষ্কারক উমর বিন মুহাম্মাদ ছিল বিদ'আতী। বিজ্ঞ আলেমদের চোখে সে ছিল

অবিশ্বাসযোগ্য। কোনো বিজ্ঞ আলেমের চোখে তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। আচ্ছা বলুন তো, যে ব্যক্তি নিজেই তৎকালীন উলামায়ে কেরামের নিকট অগ্রহণযোগ্য ছিল। এমন একজন মানুষের আবিষ্কৃত আজকের প্রচলিত মীলাদ কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? আল্লাহ আমাদের বিবেকের দুয়ার খুলে দিন।

বিদ'আতের ভয়াবহ পরিণাম

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এ কথা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রচলিত মীলাদ ও কিয়াম বিদ'আত। আর বিদ'আত ভয়াবহ গোনাহের কাজ। একদিকে এই বিদ'আত কুফর, শিরিক এর পরেই সর্বাধিক ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক গোনাহ। অন্যদিকে এ থেকে তাওবাও নসীব হয় না। কেউ সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়াতে লিপ্ত হলে এগুলো গোনাহ মনে করে একসময় তা থেকে তাওবা করে নেয় বা তাওবা করার প্রয়োজন মনে করে। কিন্তু বিদ'আত নাজায়েয ও কবীরা গোনাহ হওয়া সত্ত্বেও বাহ্যত তা নেক আমলের মতো হওয়ার কারণে সকলেই তা সওয়াবের নিয়্যাতে করে থাকে। এ কারণে কখনোই তা থেকে তাওবা করার প্রয়োজন মনে করে না। ভাবে সওয়াবের কাজই তো করছি এর জন্য আবার তাওবা কিসের। পরিশেষে তাওবা করা ছাড়াই মারা যায়। এ জন্য বিদ'আত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখা এবং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকা সকলের জন্য জরুরি। কেননা হাদীসে বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকতে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'তোমরা বিদ'আত বা নতুন আবিষ্কৃত আমল থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকো। কেননা প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত আমলই বিদ'আতের মধ্যে গণ্য এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী। (তিরমিযী, পৃ. ২৯২, আবু দাউদ, ২/২৭৯, মুসনাদে আহমাদ, ৪/২৭)

অন্য এক হাদীসে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা বিদ'আতী ব্যক্তির নামায-রোযা, দান-সদকা, হজ-উমরাহ, জিহাদ, ফরয ইবাদত ও নফল ইবাদতসহ কোনো আমলই কবুল করবেন না। আটার খামির থেকে চুল যেমন খুব সহজেই বের হয়ে আসে, ঠিক তেমনই বিদ'আতী ব্যক্তিও ইসলাম থেকে নিজের অজান্তেই বের হয়ে যায়। (ইবনে মাজাহ, পৃ. ৬)

অন্য এক হাদীসে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিদ'আতী ব্যক্তির জন্য তাওবার দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।' (কানযুল উম্মাল ১/২২০)

সর্বোপরি বিদ'আতে লিপ্ত ব্যক্তিদের রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই "দূর হও, দূর হও, যারা আমার পর বিদ'আতে লিপ্ত হয়েছে" বলে হাউজে কাওসারের পানি থেকে চিরবঞ্চিত করে দেবেন। (বোখারী/মুসলিম)

বর্তমান সমাজে মীলাদ-কিয়ামের ব্যাপক প্রচারণা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনেক মসজিদে মীলাদও হয়, সাধারণ মুসল্লিরা ব্যবসায় উন্নতি, ছেলেমেয়ের পরীক্ষায় পাস আর পড়ালেখার উন্নতি, কামাই-রোজগারের উন্নতি, বালা-মুসিবত এবং বিভিন্ন পেরেশানি থেকে মুক্তিসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মীলাদ পড়িয়ে থাকে, নতুন ঘরবাড়ি বা দোকান হলে সেখানে বরকতের জন্য এবং সওয়াবের নিয়্যাতে মীলাদ দিয়ে থাকে। অথচ ইসলামে এর কোনো ভিত্তি-প্রমাণ নেই।

ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে, সাহাবায়ে কেরামের যুগে, এমনকি তাবেঈনের যুগেও মীলাদ-কিয়ামের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই এ প্রচলিত মীলাদ-কিয়াম সম্পূর্ণ বিদ'আত এবং নাজায়েয। সকলের কর্তব্য এর থেকে বিরত থাকা এবং অন্যকে বিরত রাখা। নকল জিনিস দেখতে প্রায় আসলের মতো হলেও দামে আসল জিনিসের মতো হবে না। শুধু তা-ই নয়, আসলের মতো বানাতে পেরেছে বলে নকলকারীকে পুরস্কার দেওয়া হবে না, বরং নকল করার অপরাধে কঠিন শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে।

যেহেতু সকল বিদ'আত ইসলামে নকল আমল হিসেবে গণ্য, তাই বিদ'আতকারী পুরস্কারযোগ্য তো নয়ই বরং বিদ'আত করার অপরাধে জাহান্নামের কঠিন শাস্তিযোগ্য। যদিও সাধারণ লোকদের নিকট বিদ'আত দেখে তো বাহ্যত নেক আমলের মতোই মনে হয়, কিন্তু এটা যে বিদ'আত এবং নকল আমল তা বুঝতে আমল বিশেষজ্ঞ তথা হক্কানী উলামায়ে কেরামের কোনো কষ্টই হয় না। তাই সকলের জন্য কর্তব্য এ সকল বিদ'আত কাজ থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকা।

ফাতাওয়ার আলোকে প্রচলিত মীলাদ বিদ'আত এবং নাজায়েয

অসংখ্য ফাতাওয়ার কিতাবে প্রচলিত মীলাদ ও কিয়ামকে বিদ'আত ও

নাজায়েয বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি ফাতাওয়ার কিতাবের প্রমাণ পেশ করা হলো :

১. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করা ও যিকির-আযকার করার মাঝে সওয়াব রয়েছে, কিন্তু বর্তমানে জীবনবৃত্তান্ত আলোচনার জন্য যে সুন্নাত পরিপন্থী গর্হিত নিয়ম-নীতি অবলম্বন করা হয়, এই নিয়ম সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং তাবেঈনের কোনো যুগেই ছিল না। এর দ্বারা সওয়াবের পরিবর্তে গোনাহ হবে। এ ধরনের মজলিস থেকে দূরে থাকাই সওয়াবের কাজ। (সূত্র : খাইরুল ফাতাওয়া-১/৫৮৭)

২. প্রচলিত মীলাদ মজলিসের আয়োজন করা ভিত্তিহীন এবং বিদ'আত। সুতরাং এটা নাজায়েয। (সূত্র : ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া-১/১৯০)

৩. বর্তমানে যে প্রথাস্বরূপ মীলাদের মজলিস কায়েম করে তথায় দ্বীনি বিষয় অজ্ঞ কবিদের কবিতা এবং গর্হিত ও মনগড়া বর্ণনা সুর দিয়ে পড়া হয় এবং এই প্রচলিত পন্থায় মীলাদ পড়াকে জরুরি মনে করা হয়, এই মীলাদ-মাহফিল সুন্নাত পরিপন্থী এবং বিদ'আত। এই গর্হিত পদ্ধতি সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং তাবেতাবেঈন, আইম্মায়ে কেরাম কারো থেকেই প্রমাণিত নেই।

৪. প্রচলিত পন্থায় যে মীলাদ-মাহফিলের আয়োজন করা হয়, তা কোরআন-হাদীস এবং ফিকহের কোথাও পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে কখনো এমন করেননি, তাবেঈনগণ করেননি, তাবেতাবেঈনগণ করেননি; আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, ফুকাহায়ে কেরাম এবং মুহাদ্দিসগণের কেউ করেছেন বলেও জানা যায়নি। ছয় শত হিজরী পর্যন্ত এই মীলাদ কেউ করেননি, এরপর সুলতান আরবিল সর্বপ্রথম এর প্রচলন ঘটান।

এ ছাড়া দেখুন : (ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১১/৪৮, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া-২/২৮২, ইমদাদুল মুফতীন-১৭২, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৫/২৪৯, আযীযুল ফাতাওয়া-পৃ. ৯৮, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১/১৯৭, ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া-২২৮-২২৯, ইমদাদুল আহকাম-পৃ. ৯৫, জাওয়াহিরুল ফিকহ-১/২১১)

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

বিকাশ : ০১৮৩৮৪২৪৬৪৭, রকেট : ০১৮৩৮৪২৪৬৪৭-৯

ইসলামী হিজরী সনের স্মৃতি লুকিয়ে আছে বাংলা নববর্ষে

মাওলানা কাজী ফজলুল করিম

মানব সভ্যতার শুরু থেকেই সময়ের হিসাব ধরে রাখার মনমানসিকতা সঞ্চারিত হয়। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, 'নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে মাসের সংখ্যা বারোটি।' (সূরা তাওবা, আয়াত : ৩৬) এ কারণেই সূর্যের পরিক্রমের হিসাবের যেমন উদ্ভব ঘটে, তেমনি চন্দ্র পরিক্রমের হিসাবেরও উদ্ভব ঘটে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, 'তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং এর মনজিল নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পারো। আল্লাহ এটা নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এসব নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।' (সূরা ইউনুস, আয়াত : ৫)

হিজরী সনের ইতিকথা : বাংলা সন যে হিজরী চন্দ্র সনেরই সৌরূপ, তা সর্বজনবিদিত। বাংলাদেশে বর্তমানে যেসব সনের প্রচলন রয়েছে, তা হলো হিজরী, বাংলা ও ইংরেজি সাল। বাংলাদেশে ইংরেজি সালের ব্যবহার শুরু হয় ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত পলাশী বিপর্যয়ের পরপরই। আর হিজরী সনের প্রচলন হয় ৬৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে, যখন এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম প্রচার শুরু হয়। এখানে উল্লেখ্য, একটি ইসলামী পঞ্জিকার প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রিয় নবী (সা.)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের বছর ৬২২ খ্রিস্টাব্দকে প্রথম বছর ধরে ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে হিজরতের ঘটনার ১৭ বর্ষে এ ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে হজরত আলীর (রা.) পরামর্শে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.) কর্তৃক হিজরী সনের প্রবর্তন হয়।

উপমহাদেশে হিজরী সনের ব্যবহার : হিজরী সন প্রবর্তনের পরের বছরই অর্থাৎ ৬৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের সূচনা হয়। স্বভাবতই বাংলা অঞ্চলে যারা ইসলামে দাখিল হচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে হিজরী সনের ব্যবহার চালু হয় বিভিন্ন ইবাদত পালনের কারণেই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ইসলামী শরীয়তে চান্দ্রমাস তথা ইসলামী হিজরী সনের হিসাব রাখা ফরযে কেফায়াহ। প্রতিটি এলাকায় কোনো না কোনো ব্যক্তিকে অবশ্যই হিজরী সন-তারিখের খোঁজখবর রাখতে হবে। কেননা হিজরী সন-তারিখের সঙ্গেই সব ইবাদতের সম্পর্ক। যদি কোনো অঞ্চলে কেউ হিজরী সন-তারিখের খোঁজখবর না রাখে, তাহলে সবাইকে গোনাহগার হতে হবে। ৫৯৮ হিজরী মোতাবেক ১২০১ খ্রিস্টাব্দে সিপাহসালার ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজী (রহ.) কর্তৃক বাংলা বিজয় হলে এখানে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয়। ফলে হিজরী সন রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় সন হিসেবে মর্যাদা লাভ করে এবং সালতানাতের কাজকর্মে এই হিজরী সনের ব্যবহার হতে থাকে, যা ব্রিটিশ রাজ কায়েম হওয়ার আগ পর্যন্ত চালু থাকে।

হিজরী সনের সঙ্গে ইবাদতের সম্পৃক্ততার কারণ : হিজরী সন অতি পবিত্র চান্দ্রমাস। হিজরী সন চাঁদের পরিক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় এ সনের মাস কোনো নির্দিষ্ট ঋতুর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে না। আর সে কারণেই বিভিন্ন ঋতুতে ইবাদত পালনের ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ ও আনন্দ উপলব্ধি করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। যদি নির্দিষ্ট ঋতুর সঙ্গে হিজরী মাসের সম্পৃক্ততা থাকত, তাহলে কখনো শীতকালে, আবার কখনো গরমের মৌসুমে, আবার কখনো বা বর্ষা মৌসুমে রোযা রাখার নতুন নতুন উপলব্ধি আমাদের হতো না।

চন্দ্র ও সৌরবর্ষের দৈর্ঘ্য : সূর্য নিজ কক্ষপথ ঘুরে আসতে সময় লাগে প্রায় ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬

সেকেন্ড। একে বলা হয় সৌরবছরের দৈর্ঘ্য। অন্যদিকে চন্দ্রকলার হ্রাস ও বৃদ্ধি সম্পাদনে সময় লাগে প্রায় ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা। যে কারণে এক চান্দ্র বছর হতে সময় লাগে ৩৫৪ দিন ৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট।

হিজরী সনের নবরূপ বাংলা সন :

সম্রাট আকবর রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে হিজরী সনের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে একটি নতুন সৌর সন উদ্ভাবনের জন্য সেকালের এক পণ্ডিত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আমীর ফতেহ উল্লাহ সিরাজীকে ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে দায়িত্ব দেন। আমীর ফতেহ উল্লাহ সিরাজী সেকালে প্রচলিত ও অপ্রচলিত বিভিন্ন পঞ্জিকা তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি নতুন সৌর সন উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। শেষমেষ তিনি হিজরী চান্দ্র সনকেই সৌর গণনায় আনেন। তিনি হিজরী সনের বছর ৩৫৪ দিনের স্থলে ৩৬৫ দিনে এনে যে নতুন সন উদ্ভাবন করেন, সেটিই বাংলাদেশে বাংলা সন নামে প্রচলিত হয়। ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর এক শাহী ফরমান জারির মাধ্যমে এই রাজস্ব সন বা ফসলি সন প্রবর্তনের ঘোষণা প্রদান করেন। এই নতুন সন গণনার সূচনা বছর হিসেবে ধরা হয় বাদশাহ আকবরের মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়ার বছর, অর্থাৎ ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৯৬৩ হিজরীকে। এই নতুন সৌর সন হিজরী সনকে ধারণ করে সৌর নিয়মে এগিয়ে যায়। হিজরী চান্দ্র সনের স্মৃতি ও পবিত্রতা স্বাভাবিকভাবেই বাংলা সনের মধ্যে বিরাজ করছে।

বাংলা বারো মাসের নামকরণ :

১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলাদেশে বাংলা সন প্রচলিত হয়। এই সন সম্রাট আকবর কর্তৃক গঠিত সুবা বাংলায় বিশেষ সন হিসেবে সর্বসাধারণ গ্রহণ করে। এই সনের প্রথম মাস হিসেবে গ্রহণ করা হয় শকাব্দের দ্বিতীয় মাস বৈশাখকে। আর শকাব্দের প্রথম মাস চৈত্র হয়ে যায় নতুন সনের দ্বাদশ মাস। শক রাজার নাম অনুযায়ী বহু আগে এই উপমহাদেশে শকাব্দের প্রচলন ছিল। এই নতুন বাংলা সনের সঙ্গে শকাব্দের মাসগুলো যুক্ত করা হয়। একমাত্র অগ্রহায়ণ মাস ছাড়া অন্য ১১টি মাস একেকটি নক্ষত্রের নাম ধারণ করে আছে।

বাংলাদেশে বাংলা সন : বাংলা সন হিজরী সনেরই সৌররূপ। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে বাংলা পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি গঠন করে। এই কমিটি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পঞ্জিকা সংস্কার করে। কমিটির এতদসংক্রান্ত সুপারিশমালার ভূমিকায় বলা হয়, মোগল আমলে সম্রাট আকবরের সময় হিজরী সনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে যে বঙ্গাব্দ প্রচলন করা হয়েছিল, তা থেকে বছর গণনা করতে হবে। ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে গঠিত ওই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলা পঞ্জিকার কিছু কিছু সংস্কার করা হয়। বাংলা সনের মাসগুলো যাতে নির্দিষ্টসংখ্যক দিবসের হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়, তা ভেবে বাংলা সনের প্রথম মাস বৈশাখ থেকে বাংলা সনের পঞ্চম মাস ভাদ্র পর্যন্ত প্রতিটি মাস ৩১ দিনে হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং একইভাবে বাংলা সনের ষষ্ঠ মাস আশ্বিন থেকে দ্বাদশ মাস চৈত্র পর্যন্ত প্রতিটি মাস ৩০ দিনে হওয়ার কথা বলা হয়। লিপইয়ার বা অধিবর্ষ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, অধিবর্ষ বা লিপইয়ারের চৈত্র মাস ৩১ দিনে হবে। তাই বলতে হয়, বর্তমান বাংলা সনের প্রতিষ্ঠাতা আমীর ফতেহ উল্লাহ সিরাজী এবং এর সংস্কারক হলেন ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

বাংলা সনের ঐতিহ্য ও আমাদের স্বকীয়তা :

বাংলা সন বাংলাদেশের মানুষের নিজস্ব সন। এর উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস ইসলামী উত্তরাধিকার হতে প্রাপ্ত। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের ঐতিহ্যগত অনুভূতি। আমাদের নিজস্বতা, আমাদের স্বকীয়তা। এ ক্ষেত্রে যাতে আমাদের ইসলামী মূল্যবোধ বজায় থাকে সেদিকে অবশ্যই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। নববর্ষ পালনের নামে উচ্ছৃঙ্খলা, মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে মঙ্গল কামনা করা, উলুধ্বনি দেওয়া, এগুলো আমাদের বাংলা সনের ঐতিহ্যগত বিষয় নয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে ওই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।' (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৩৫১২)

মনে রাখতে হবে, বাংলা নববর্ষের মাঝে লুকিয়ে আছে ইসলামী হিজরী সনের স্মৃতি ও পবিত্রতা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি পড়তেন

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী

রাসূলুল্লাহ (সা.) সূর্যাস্তের সাথে সাথে মাগরিবের নামায পড়তেন এবং সাহাবাগণকেও তাড়াতাড়ি পড়ার নির্দেশ করতেন।

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমাম বোখারী (রহ.) প্রসিদ্ধ সাহাবী রাফে' বিন খাদীজ থেকে বর্ণনা করেন–

كنا نصلى المغرب مع النبى فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে আমরা মাগরিবের নামায পড়তাম। অতঃপর প্রত্যাবর্তনকালে আমাদের কেউ কেউ সূর্যের আলোতে তীর নিক্ষেপের কেন্দ্রবিন্দুটিও দেখতে পেত। (সহীহ বোখারী : ১/৭৯, হা. ৫৫৯)

আবু আইয়ুব (রা.) থেকে বর্ণিত,

قال رسول الله ﷺ صلوا المغرب لفطر الصائم

"রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, রোযাদারের ইফতারের সময় তোমরা মাগরিবের নামায পড়ো। (মুসনাদে আহমদ : ৫/৪২১, হা. ২৩৬৪২, হাদীসটি সহীহ। এ হাদীসটিকে তথাকথিত আহলে হাদীস গবেষক আল্লামা আলবানীও সহীহ বলেছেন। (সিল : সহীহা, হা. ১৯১৫)

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,

صلوا صلاة المغرب مع سقوط الشمس

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তোমরা মাগরিবের নামায পড়ো। (তাবরানী কাবীর : ৪/১৭৬, হা. ৪০৫৮। আল্লামা হায়সামী এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। মাজমা : ১/৩১০)

উকবা বিন আমের (রা.) একদিন বিভিন্ন ব্যস্ততাহেতু মাগরিবের নামায বিলম্বে পড়েন। তা দেখে আবু আইয়ুব (রা.) বলেন, এটি কেমন নামায? তুমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শোনোনি–

لايزال أمتى بخير، أو على الفطرة، مالم يؤخروا المغرب

যত দিন পর্যন্ত আমার উম্মত মাগরিবের নামাযে বিলম্ব না করবে, তত দিন তারা কল্যাণ ও নিরাপত্তায় বা ইসলামের সঠিক পথে থাকবে। (আবু দাউদ : ১/৬০, হা. ৪১৮। মু. আহমদ : ৪/১৪৭, হা. ১৭৩৩৭। হাকেম : ১/১৯০-১৯১, হা. ৬৮৫ সহীহ)

উল্লিখিত হাদীসসমূহের আলোকে মাগরিবের নামায যথাসাধ্য সূর্যাস্তের সাথে সাথে পড়ে নেওয়া উত্তম। অবশ্য কোনো কোনো হাদীসে বিলম্ব করার কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে ওই হাদীসগুলোর আলোকে মাগরিবের নামায বিলম্বে পড়া উত্তম হবে না। বরং কারণবশত বিলম্ব করার অনুমতি হবে মাত্র। এ ছাড়া ইমাম আবু যুরআ (রহ.) বলেন, মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি পড়ার হাদীসগুলোই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধতম। (মাউসুয়া আহমদ : ২৮/৫৬৫)

আহলে হাদীস গবেষক কাজী শাওকানী (রহ.) লিখেন,

قال النووى فى شرح مسلم "إن تعجيل المغرب عقيب غروب الشمس لجمع عليه"

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, মাগরিবের নামায অবিলম্বে পড়ার ওপর সমস্ত মুসলিম উম্মাহর ইজমা তথা ঐক্যবদ্ধ আমলে পরিণত হয়েছে। (নাইলুল আউতার : ২/৪)

অতএব মাগরিবের আযানের পর মুসল্লিদের অপেক্ষা করা অথবা সুন্নাত-নফল পড়ে মাগরিবের নামায বিলম্ব করা ঠিক হবে না। বরং আযানের সাথে সাথে নামায পড়াই উত্তম ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত মোতাবেক হবে। কিন্তু বর্তমানে কিছু জাহেরী মতাদর্শের লোক মাগরিবের আযানের পর সুন্নাত পড়ার নামে দীর্ঘক্ষণ বিলম্বের সুযোগ নিয়ে থাকে। এ ব্যাপারে কিছু হাদীসের ভিত্তিতে তাদের অবাস্তব সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নে তাদের সংশয়গুলো নিরসনসহ পেশ করা হচ্ছে।

সংশয় : ১

তথাকথিত আহলে হাদীস বন্ধুরা মাগরিবের নামাযের পূর্বে সুন্নাত পড়ার দলিল হিসেবে সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.)-এর হাদীস ব্যবহার করে থাকে। এতে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

بين كل أذانين صلاة

প্রত্যেক নামাযের আযান ও ইকামতের মাঝে নামায রয়েছে। (সহীহ বোখারী : ১/৮৭, হা. ৬২৭)

উক্ত হাদীসের আলোকে তারা বলতে

চায়, হাদীসে كل শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আরবীতে كل শব্দ দ্বারা সমগ্র বিষয়কে বোঝানো হয়। তাই সব আযানের পরই সুন্নাত পড়তে হবে। মাগরিবের নামায এর আওতামুক্ত হওয়ার সুযোগ নেই।

নিরসন : ক.

كل শব্দটি শুধু সমগ্র কিছু বোঝানোর জন্য ব্যবহার হয় না। বরং কোনো কোনো সময় অল্প কিছু বা বেশি অংশ বোঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা–কোরআনে কারীমে ইরশাদ আছে,

ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا

আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ.)-কে বলেন, 'চারটি পাখি ধরে নিজের আয়ত্তে নাও। অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ সব (বিভিন্ন) পাহাড়ের ওপর রেখে দাও।' (সূরা বাকারা : ২৬০)

উক্ত আয়াতে كل جبل (সব পাহাড়) বলতে পৃথিবীর সমগ্র পাহাড় বোঝানো হয়নি। বরং হাতে গোনা কয়েকটি পাহাড় (যা তাফসীর বিশারদদের মতে চারটি) বোঝানো হয়েছে। ঠিক তদ্রূপ হাদীসেও كل (সব) শব্দটি সমগ্র নামাযের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত নয়। বরং মাগরিবের নামায ছাড়া অন্যান্য চার ওয়াক্ত নামায বোঝানো হয়ে৬ছে। যার ব্যাখ্যা অন্য হাদীসেও আছে। এমন একটি সহীহ হাদীস নিম্নে আলোচনা করা হবে।

খ.

উপরোক্ত হাদীসে প্রত্যেক নামাযের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সুন্নাত নামায রয়েছে বলতে কোন কোন নামাযের সময় বোঝানো হয়েছে, এর সুস্পষ্ট বর্ণনা উপরোল্লিখিত হাদীসে উল্লেখ নেই। অতএব মাগরিবের নামাযের পূর্বে সুন্নাত পড়া যাবে কি না, এতে আদৌ চিহ্নিতভাবে উল্লেখ করা হয়নি। বরং কোন নামাযের পূর্বে সুন্নাত পড়া যাবে আর কোন নামাযের পূর্বে সুন্নাত পড়া যাবে না, এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রখ্যাত সাহাবী হযরত বুরাইদা (রা.)-এর হাদীসে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে, যা পূর্বোল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করা যায়। তিনি বলেন–

إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب

অবশ্যই মাগরিব নামায ব্যতীত প্রত্যেক নামাযের আযান-ইকামতের মাঝে সুন্নাত নামায রয়েছে। (দারাকুতনী : ১/২১৪ হা. ১০২৭, বায়হাকী : ২/৪৭৫ হা. ৪৪৯১)

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে,

عند كل أذانين ركعتان قبل الإقامة ماخلا أذان المغرب

মাগরিব ব্যতীত প্রত্যেক নামাযের আযানের পর ইকামতের পূর্বে দুই রাক'আত নামায আছে। (দারাকুতনী : ১/২১৪, হা. ১০২৯, বায়হাকী : ২/৪৭৫, হা. ৪৪৯২)

হাদীস দুটির আলোকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে ফজর, জোহর, আসর ও এশার পূর্বে সুন্নাত নামায রয়েছে। তবে কেবল মাগরিবের পূর্বে কোনো সুন্নাত নামায নেই।

আলোচ্য হাদীসদ্বয় সহীহ। বর্ণনাকারী সবাই (ثقة) নির্ভরযোগ্য। তবে উভয় বর্ণনায় একজন বর্ণনাকারী "হাইয়্যান" সম্পর্কে কারো কারো ভুল ধারণা রয়েছে। হাইয়্যানকে তাঁরা দুর্বল (যয়ীফ) বলে অভিহিত করেছেন। এর নিরসনকল্পে ইমাম সুয়ূতী (রহ.) বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারী "হাইয়্যান বিন উবায়দিল্লাহ বছরী" (ثقة) (নির্ভরযোগ্য) আর যে "হাইয়্যান"কে দুর্বল বলা হয় তিনি হলেন "হাইয়্যান দারামী"। তাই উপরোল্লিখিত হাদীসের বর্ণনাকারী "হাইয়্যান"কে ইমাম বাযযার, আবু হাতেম, ইবনু হিব্বান, যাহাবী সকলেই নির্ভরযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং ইমাম হাকিম উল্লিখিত হাদীসের সনদটিকে বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। (মায়ারেফুস সুনান : ২/১৪১, আল-জারহ ওয়াত্‌তাদীল : ৩/২৪৬, ছিক্বাত ইবনে হিব্বান : ৬/২৩০, হাকিম মুসতাদরাক : ২/৪৩) তাই এ হাদীসটি দুর্বল বলা নিছক ভুল ধারণা ও এক ধরনের কারচুপি মাত্র। তাই বিজ্ঞজন এমন বলতে পারেন না।

সংশয় : ২

তাদের আরো একটি সংশয় হলো যে, কোনো কোনো সাহাবী, এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকেও মাগরিবের পূর্বে সুন্নাত পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ মর্মে তারা হাদীসে আনাস (রা.) পেশ করে থাকে–

قال :كنا نصلي على عهد رسول الله ﷺ ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له :أكان رسول الله صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا.

"আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জমানায় সূর্যাস্তের পর মাগরিবের আগে দুই রাক'আত নামায পড়তাম, এ কথা বলার পর বর্ণনাকারী আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কি তা পড়তেন? তদুত্তরে তিনি বলেন, তিনি পড়েননি তবে তিনি আমাদের পড়তে দেখে এ ব্যাপারে কোনো আদেশ-নিষেধ করেননি। (সহীহ

মুসলিম : ১/২৭৮, হা. ৮৩৬)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.) থেকে অন্য একটি বর্ণনায় আছে,

صلوا قبل صلاة المغرب ... وزاد ابن حبان :أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين

বোখারী শরীফের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, মাগরিবের নামাযের পূর্বে তোমরা নামায পড়ো। (সহীহ বোখারী : ১/১৫৭, হা. ১১৮৩)

ইবনু হিব্বান উল্লেখ করেছেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.) মাগরিবের পূর্বে দুই রাক'আত নামায পড়েছেন। (সহীহ ইবনু হিব্বান : ৪/৪৫৭, হা. ১৫৮৮ হাদীসটি সহীহ)

নিরসন : ক.

উপরোক্ত হাদীস দুটিতে সাহাবাগণ ও রাসূলুল্লাহ (সা.) মাগরিবের পূর্বে দুই রাক'আত নামায পড়েছেন বলে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এ হাদীস দুটি ওই সমস্ত হাদীসের সঙ্গে বিরোধ বোঝায়, যাতে সাহাবাগণ মাগরিবের নামায সূর্যাস্তের সাথে সাথে তাড়াতাড়ি পড়তেন। সুতরাং যেহেতু মাগরিবের পূর্বে সুন্নাত পড়তে গেলে ফরয নামায তাড়াতাড়ি পড়ার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবাগণের অনুকরণ সম্ভব হয় না, তাই সুন্নাত না পড়াই উত্তম। উল্লেখ্য, ইমাম আবু যুরআ মাগরিবের নামায অবিলম্বে পড়ার হাদীসসমূহকে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ বলেছেন। (সিলসিলায়ে সহীহা আলবানী : ১/৪৬৯), যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই সুন্নাত না পড়ে ফরয নামায তাড়াতাড়ি পড়াই প্রাধান্যযোগ্য হবে। (আল মিনহাজ : ৫/৩৬২) বরং ইবরাহীম নাখয়ী আরো এগিয়ে "মাগরিবের পূর্বে সুন্নাত পড়াকে বিদ'আত গণ্য করেন। এ মর্মে ইমাম নববী (রহ.) লিখেন–আবু বকর, উমর, উসমান, আলী (রা.) প্রমুখ অধিকাংশ সাহাবা ও তাবেঈগণ এবং ইমাম মালেকসহ অধিকাংশ ফিকহ বিশারদ ইমামগণ মাগরিবের পূর্বে সুন্নাত পড়াকে মুস্তাহাব মনে করতেন না। (প্রাগুক্ত)

উপরন্তু কিছু হাদীসে সুন্নাত পড়া নিষিদ্ধ বোঝাচ্ছে আর কয়েকটি হাদীসে সুন্নাত পড়া বৈধ বোঝাচ্ছে। এমতাবস্থায় হাদীস শাস্ত্রের সর্বসম্মত ধারায় নিষেধ বোঝায় হাদীসগুলোই গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

খ. অসংখ্য দলিল-প্রমাণ রয়েছে যে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং কোনো সাহাবীই মাগরিবের পূর্বে সুন্নাত নামায পড়তেন না, যা নিম্নে বর্ণনা করা হবে। তাই উপরোক্ত হাদীস দুটিকে উল্লিখিত অর্থে বলা যায় না। বরং নির্দ্বিধায় বলা যায় যে হাদীস দুটিতে মাগরিবের পূর্বে সুন্নাত পড়া অপছন্দনীয় বা মাকরূহ হওয়া সত্ত্বেও কেবল জায়েয বোঝানো হয়েছে। তাই এ দুটি হাদীসের আলোকে মাগরিবের পূর্বে সুন্নাত পড়া বৈধ হলেও অপছন্দনীয় হবে এবং মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি পড়া ও সুন্নাত না পড়ার হাদীসের আলোকে সুন্নাত না পড়াই উত্তম হবে।

বোখারী শরীফের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকারক আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) লিখেন, ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে কখনো কখনো মাগরিবের পূর্বে সুন্নাত পড়া হতো। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে মাগরিবের নামায অবিলম্বে পড়ার তাগিদ আসার কারণে আর কেউই মাগরিবের পূর্বে সুন্নাত পড়তেন না। (উমদাতুল ক্বারী : ৫/৫৫৪)

এ মর্মে প্রমাণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি বিশুদ্ধ হাদীস পেশ করা হচ্ছে, প্রসিদ্ধ তাবেঈ তাউস (রহ.) বর্ণনা করেন,

سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال :مارأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-কে মাগরিবের পূর্বে দুই রাক'আত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে কাউকেই তা পড়তে দেখিনি। (আবু দাউদ : ২/১৮২, হা. ১২৮৪, হাদীসটি হাসান)

সুপ্রসিদ্ধ তাবেঈ ইব্রাহীম নাখয়ী (রহ.) থেকে বর্ণিত–

ماصلى أبوبكر و عمر وعثمان الركعتين قبل المغرب

খোলাফায়ে রাশেদীন, আবু বকর (রা.), উমর (রা.) ও উসমান (রা.) কেউই মাগরিবের পূর্বে দুই রাক'আত পড়তেন না। (বায়হাকী : ২/৪৭৬, হা. ৪৫০০, উমদাতুল ক্বারী : ৫/৫৫৪)

ইমাম তাবরানী (রহ.) মুসনাদুশ শামীইন কিতাবে হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করি যে আপনারা কি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মাগরিবের পূর্বে দুই রাক'আত পড়তে দেখেছেন? তাঁরা বলেন–না, পড়েননি। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রীগণই তাঁর নফল নামায সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত ছিলেন। (বাযলুল মাজহুদ : ৭/২২)

তা ছাড়া মাগরিবের নামাযের পূর্বে দুই রাক'আত নামায পড়া মাকরূহ হওয়ার পেছনে যৌক্তিকতাও আছে। প্রখ্যাত

মুহাদ্দিস ও হাদীস বিশারদ আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.)
বলেন, মানুষ যখন মাগরিবের পূর্বে দুই রাক'আত সুন্নাত নামায আদায় করবে তাহলে সকলের জন্য একই সময়,
একই তাহরীমায় একই সাথে নামায পড়া অসম্ভব। বরং কেউ আগে, কেউ পরে, কেউ তাড়াতাড়ি আবার কেউ ধীরে ধীরে নামায আদায় করবে। আর ইমাম সাহেব এদের জন্য অপেক্ষা করলে অবশ্যই মাগরিবের নামায বিলম্ব করে পড়তে হবে, যা মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি পড়া মর্মের হাদীসের পরিপন্থী। আর অপেক্ষা না করলে তাদেরকে ইকামতের সময় নামায পড়তে হয়, যা মাকরূহ বলে বিবেচ্য। অথবা তারা কমপক্ষে তাকবীরে উলা থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ ছাড়া আযানের পর একটি লম্বা দু'আও হাদীসে আছে। তাই সকল ক্ষেত্রেই মাগরিবের নামাযের পূর্বে সুন্নাত নামায আদায় করতে গেলে উল্লিখিত সব সুন্নাত ছেড়ে দিতে হয়। বিধায় তা বর্জনীয়। (বাযলুল মাজহুদ : ৭/২২)
অতএব উল্লিখিত বর্ণনার আলোকে ও যুক্তির নিরিখে মাগরিবের পূর্বে সুন্নাত নামায পড়া অবশ্যই মাকরূহ বলে গণ্য হবে। তাই মাগরিবের আযানের পর সুন্নাত না পড়ে অবিলম্বে ফরয নামায আদায় করাই উত্তম।

গ. ইমাম আলবানী ও ইবনুল কাইয়্যিমের অভিমত

তথাকথিত আহলে হাদীস মতবাদের সর্বসম্মত ইমাম, হাদীস গবেষক আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রাসূলুল্লাহ (সা.) মাগরিবের পূর্বে সুন্নাত পড়েছেন এ বর্ণনাটি উল্লেখকরত লিখেন,

شاذ من فعله صلى الله عليه وسلم

মাগরিবের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.) নামায পড়েছেন বলে যে বর্ণনা রয়েছে তা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুল্লেখযোগ্য একটি বিচিত্র আমল। কেননা তা অপেক্ষাকৃত অসংখ্য বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপরীত। (সিলসিলাতুল আহাদিসুস সহীহা : ১/৪৬৭, হা. ২৩৩)
ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম সুদৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন–

جزم ابن القيم بأنه لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم فعله

মাগরিবের পূর্বে সুন্নাত পড়েছেন, এমন কোনো বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে মোটেই উল্লেখ নেই।
(মাওয়ারিদুজ্জামআন (যয়ীফ অংশ) : পৃ. ৪০, হা. ৬১৭ বাব ১২১)
ইমাম আছরাম (রহ.) ইমাম আহমদ থেকে বর্ণনা করেন–

ما فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث

মাগরিবের পূর্বে আমি শুধু একবার নামায পড়েছিলাম, যখন আমি মাগরিবের পূর্বে নামায পড়ার হাদীসটি শুনেছিলাম। (উমদাতুল ক্বারী ৫/৫৫৪)
তাই মাগরিবের ইকামতের পূর্বে সুন্নাত নামায পড়া, বিশেষ করে নিয়মিত পড়া মোটেই কোরআন-হাদীস সমর্থিত কাজ নয়।

এশার নামাযের ওয়াক্ত

ইতিপূর্বেই আলোচনা হয়েছে যে মাগরিবের নামাযের উত্তম সময় হলো, সূর্যাস্তের সাথে সাথে অবিলম্বে আদায় করা। তবে কোনো কারণবশত যদি উত্তম সময়ে তথা সূর্যাস্তের সাথে সাথে নামায পড়া সম্ভব না হয়, সন্ধ্যা বেলায় আকাশের সাদা রেখা অস্ত যাওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামায আদায় করা যাবে। আর ওই সাদা রেখা অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে এশার নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। সাদা রেখা বলতে সূর্যাস্তের পর প্রথম আকাশে সূর্যের আলোর প্রতিচ্ছায়া লাল বর্ণের দেখা যায়। ক্রমান্বয়ে তা সাদা বর্ণ ধারণ করে। এ সাদা বর্ণ অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত মাগরিবের নামায পড়ার সময় থাকে। অতঃপর এশার ওয়াক্ত শুরু হয়।
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس مالم يسقط الشفق

"মাগরিবের ওয়াক্ত হলো সূর্যাস্তের পর থেকে আকাশের সাদা রেখা অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।" (সহীহ মুসলিম : ১/২২৩, হা. ৬১২ এ হাদীসে شفق বা সাদা রেখা বুঝতে অনেকের সংশয় সৃষ্টি হয়। তবে তা অন্য হাদীসে بياض النهار هو الشفق দিনের অবশিষ্ট আলোর ছায়াই شفق সাদা রেখা। তাবরানীর এ হাদীসটিকে হায়ছামী حسن বা উত্তম বলেছেন। মাজমাউজ্জাওয়াইদ : ১/৩০৪ অতএব شفق শব্দের অর্থ নিয়ে নিজেদের গবেষণা করার প্রয়োজন নেই।)
হযরত আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-কে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ওই দিন এশার নামায সাদা রেখা অস্ত যাওয়ার সাথে সাথেই পড়েন–

فأقام العشاء حين غاب الشفق

"এশার নামায সাদা রেখা অস্ত যাওয়ার সাথে সাথেই পড়েন এবং পরদিন এশার নামায রাতের প্রথম ভাগের

এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি সময়ে পড়েন।"

ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل

"এশার নামায রাতের প্রথম ভাগের এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি সময়ে পড়েন।" এবং প্রশ্নকারীকে বলেন :

الوقت بين هذين

এই দুই সময়ের মধ্যবর্তী সময় (এশার) ওয়াক্ত। (সহীহ মুসলিম : ১/২২৩, হা. ৬১৪)

এ হাদীসের আলোকে রাতের প্রথম ভাগের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত এশার নামায পড়ে নেওয়া উত্তম। তবে অন্যান্য হাদীসের আলোকে রাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত এশার নামায পড়া বৈধ। কেননা অসংখ্য হাদীসে রয়েছে وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل "এশার সময় অর্ধ রাত পর্যন্ত।" (সহীহ মুসলিম : ১/২২৩, হা. ৬১২)

তাই এর পূর্বেই এশার নামায পড়া জরুরি। তবে যদি অনিবার্য কোনো কারণবশত অর্ধরাতের পূর্বে এশা না পড়া যায় তাহলে শেষ রাত তথা সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত পড়া যাবে। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত হাদীসগুলোর অনুসরণ না করার কারণে নামায মাকরূহ হবে। তবে নামায আদায় হয়ে যাবে। এ মর্মে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে–

قال لأبي هريرة :ما افراط صلاة العشاء قال :طلوع الفجر

এশার সর্বশেষ সময় জিজ্ঞাসা করার পর আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, সুবহে সাদিক উদয় পর্যন্ত। (ত্বহাবী : ১/১৫৯ হাদীস সহীহ)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক ও শ্রেষ্ঠ সময়ে নামায আদায় করার তাওফীক দিন। আমীন!

(৪৫ পৃষ্ঠার পর)

ইসলামী শরীয়ত এই দিনের জন্য এই শিক্ষাও দিয়েছেন যে এদিন পরিবার-পরিজনের মধ্যে খানাপিনায় প্রশস্ত করা উত্তম। কারণ এর বরকতে সারা বছর রিজিকের দরজা প্রশস্ত হবে। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে–

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَنَتَهُ كُلَّهَا

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে আশুরার দিন নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য খানাপিনা প্রশস্ত করবে আল্লাহ তা'আলা পুরো বছর প্রশস্ত করে দেবেন। (আল মুজামুল আওসাত [তাবারানী] হা. ৯৩০২, মুজামু ইবনুল আরাবী হা. ২২৫, আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২/১১৫)

এই হাদীসের বর্ণনা সূত্রে দুর্বলতা আছে। তবে ইবনে হিব্বান (রহ.)-এর মতে, এটি 'হাসান' পর্যায়ের হাদীস। ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর দাবি হলো, রিজিকে প্রশস্ততার ব্যাপারে কোনো হাদীস নেই। এটি ধারণাপ্রসূত। ইমাম আহমদ (রহ.) বলেছেন, এটি বিশুদ্ধ হাদীস নয়। অর্থাৎ সত্তাগতভাবে এটি বিশুদ্ধ হাদীস নয়। তবে এ বিষয়ে একাধিক বর্ণনা থাকার কারণে 'হাসান' হওয়া অস্বীকার করা যাবে না। আর 'হাসান লিগাইরিহি' দ্বারা দলিল দেওয়া যায়। (আস সওয়াইকুল মুহরিকা আলা আহলির রফযি ওয়াদ দালাল ওয়ায যানদিকা ২/৫৩৬)

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে মাহে মুহাররম এবং আশুরা অত্যন্ত বরকতময় ও তাৎপর্যপূর্ণ। সুতরাং আমাদের উচিত এই মহান মাসের বরকত অর্জনে বেশি বেশি ইবাদতে মশগুল হওয়া। কিন্তু বর্তমান সময়ে আশুরার দিন বিভিন্ন কুসংস্কারের প্রচলন দেখা যায়। যার কারণে মুহাররম ও আশুরার বরকত অর্জনের পরিবর্তে গোনাহ এবং পাপ হয়। তাই সকল মুসলমানের উচিত এরূপ বিদ'আত ও কুসংস্কার থেকে নিরাপদ থাকা। যেমন :

আশুরা এলে দেশের বিভিন্ন স্থানে দেখতে পাওয়া যায় যে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) ও হযরত হাসান (রা.)-কে উপলক্ষ করে নানা রকম অমানবিক, অযৌক্তিক কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে। যেমন- জারিগান, পুঁথি পাঠ, হালুয়া, রুটি বিতরণ, কৃত্রিম শোকে মুহ্যমান হয়ে কালো কাপড় পরিধান, শূন্যপদে দিন কাটানো, মাথায় টুপি ব্যবহার না করে লাল কাপড় পেঁচানো, নিরামিষ আহার, হযরত ইমাম হোসাইনের মুহাব্বতে ভাড়াটিয়া লোক দ্বারা নিজ বক্ষে, পিঠে ছুরিকাঘাত করা, হায় হাসান! হায় হোসাইন! হায় আলী! ইত্যাদি বলে বিলাপ করা। পরস্পরে রক্তারক্তির মাধ্যমে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাকে অলীক ও বিকৃতরূপে রূপায়িত করা। কথিত 'হাফত দানা' পাকানো নিজের শিশুসন্তানদের না দিয়ে মৌলভী-মুন্সিদের জন্য অপেক্ষা করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের ভিত্তি ইসলামী শরীয়তে নেই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের যাবতীয় কুসংস্কারমুক্ত হয়ে মাহে মুহাররম ও আশুরার বরকত অর্জনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

মতভেদ কি শুধু নামাযের মাসায়েল নিয়ে?

মুফতী লুৎফুর রহমান ফরায়েজী

অনেক ভাই মনে করেন, বাংলাদেশে প্রচলিত নতুন মতবাদ 'লা-মাযহাবী' বা কথিত আহলে হাদীস ভাইদের সাথে বাংলাদেশের উলামা-মাশায়েখের মতভেদ নামাযের কিছু মাসায়েল নিয়ে।

সৌদি আরবসহ আরব বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রেই লা-মাযহাবীরা যে পদ্ধতিতে নামায পড়ে থাকে, সে পদ্ধতির নামায প্রচলিত। সুতরাং এসব বিষয় নিয়ে বাহাস-মুবাহাসা, বিতর্ক, বক্তব্য দেওয়া উচিত নয়।

কিন্তু আসল বিষয় অনেক ভাইয়েরাই অনুধাবন করতে পারেন না।

নামায আদায় পদ্ধতির কিছু শাখাগত মাসায়েলের মতভেদ সাহাবা আমল থেকেই প্রচলিত। সেই স্বর্ণযুগ থেকেই এসব মাসআলা নিয়ে মতভেদ ছিল; কিন্তু ঝগড়া ছিল না।

শাখাগত এসব মতভেদের কারণে একদল অপর দলকে ভ্রান্ত বলত না। একদল আরেক দলকে গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট বলে ফতোয়া দিত না। যাঁরা মক্কা-মদীনায় গিয়েছেন তাঁরা নিজ চোখেই দেখেছেন যে কেউ আমীন জোরে বলছে, কেউ আস্তে বলছে। এমনকি ইমাম আমীন আস্তে বলছেন, কিন্তু মুয়াজ্জিন আমীন জোরে বলছেন। যেমন–বাইতুল্লাহ শরীফের প্রথম সারির ইমাম আব্দুর রহমান সুদাইসী সাহেব নামাযে আমীন আস্তে বলেন, কিন্তু তাঁরই পেছনে দাঁড়িয়ে মুয়াজ্জিন আমীন জোরে বলছেন। কিন্তু এ নিয়ে কোনো বিতণ্ডা নেই। ঝগড়া নেই। ফতোয়াবাজি নেই। যে যার মতো আমল করছে। যেহেতু উভয় আমলই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যাদের কাছে যে আমলটি সূত্র পরম্পরায় আমলীসূত্রে বিশুদ্ধ হিসেবে প্রমাণিত, তিনি সেই আমল করছেন। ভিন্ন আমলটিকে ভুল বলছেন না। আবার সেই আমলটি নিজেও করছেন না।

এটাই ইসলামের সৌন্দর্য। শাখাগত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও মৌলিক বিষয়ে একতাবদ্ধ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের বাংলাদেশে প্রচলিত নতুন মতবাদী 'লা-মাযহাবী' বন্ধুরা এ শাখাগত মতভেদকে মৌলিক মতভেদ বানিয়ে এলাকায় এলাকায় ঝগড়ার সৃষ্টি করছেন। আলাদা মসজিদ তৈরি করছেন।

এখানে গভীরভাবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, বাংলাদেশে প্রচলিত লা-মাযহাবী বন্ধুদের সাথে উলামায়ে হকের মতভেদ কি শুধু নামাযের কতিপয় মাসআলা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ?

না, কস্মিনকালেও না। সালাফে সালেহীনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, সাহাবা-আজমাঈনগণের আমলকে পেছনে ফেলে দিয়ে আমাদের এসব ভাইয়েরা যে নতুন থিওরি উদ্ভাবন করেছেন 'কোরআন-হাদীস পড়ে নিজে যা বুঝব তাই শরীয়ত' এই মানসিকতার কারণে অনেক মৌলিক বিষয়ে তাঁদের ভয়ানক কুফরী প্রকাশ পাচ্ছে।

যা আমাদের অনেক সরলপ্রাণ মুসলিমগণ জানেন না। আমরা আজকের এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের লা-মাযহাবী শায়েখদের কয়েকটি ভয়ানক বক্তব্য তাঁদেরই প্রকাশনী থেকে বের করা বই থেকে তুলে ধরছি।

বিজ্ঞ পাঠকগণ আশা করি, উপলব্ধি করবেন যে লা-মাযহাবী মতবাদ শুধু নামাযের কতিপয় মাসআলা নিয়েই বাড়াবাড়িতে লিপ্ত নয়, বরং পুরো শরীয়তে ইসলামিয়ার চেহারা পাল্টে দেওয়ার ভয়ানক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ পাঠ শিরক?

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" উচ্চারণ করলে বা লিখলে শিরকী অর্থ প্রকাশ পায়। [আকীদার মানদণ্ডে ইসলামের মূলমন্ত্র কালিমাহ তাইয়্যিবাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লেখক–আব্দুল্লাহ আল ফারূক-৬৯]

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বাক্যটি অশুদ্ধ এবং দারুল ইফতা বাংলাদেশসহ অন্য আলেমগণ কর্তৃক প্রচলিত কালিমার বঙ্গানুবাদও সঠিক নয় বরং আমরা ইতিপূর্বে আরবী ভাষার অলংকরণ শাস্ত্র নাহুর তারকীব বা বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ করেছি যে বাক্যটির সঠিক বঙ্গানুবাদ হবে "কেই কোনো উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত তিনি আল্লাহর রাসূল।" [প্রাগুক্ত-১৫৭]

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সুন্নাত পরিত্যাগ করা ও অপছন্দ করা। [প্রাগুক্ত-২১৭]

"প্রচলিত কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ এর ভুল সংশোধন"। [মাযহাবীদের গুপ্তধন, লেখক, মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, পৃষ্ঠা-৩৩]

হযরত উমর (রা.) কোরআনবিরোধী রায় দিয়েছেন?

"এটি ছিল উমর (রা.)-এর ইজতিহাদ মাত্র। তা দ্বারা রাজঈ তালাকের কোরআনী পদ্ধতিকে বাতিল করা যায় না। উমর (রা.) এটি করেছিলেন লোকদের ভয় দেখানোর জন্য সাময়িক কঠোরতা হিসেবে। কিন্তু এতে তাঁর উদ্দেশ্য হাসিল হয়নি বিধায় মৃত্যুর পূর্বে তিনি লজ্জিত হয়ে দুঃখ প্রকাশ

করেছিলেন। [তালাক ও তাহলীল-৩৫-৩৬, লেখক-ড. আসাদুল্লাহ গালিব]

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) স্মৃতিভ্রম ছিলেন?

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর শেষ বয়সে স্মৃতি ভ্রম ঘটে। [তাওহীদ পাবলিকেশন্স প্রকাশিত সহীহুল বোখারী-১/৩৫৭]

মাযহাব অনুসরণ কুফর ও শিরক?

"ঠিক এই কাফেরদের মতোই বর্তমানে যারা মাযহাবের অনুসারী তারা চার মাযহাবের যেকোনো একটির অনুসরণ করে তাদের বাপ-দাদাদের মাযহাব অনুযায়ী। অর্থাৎ বাবা যদি হানাফী হয় তাহলে ছেলেও হানাফী হয় এবং বাবা যদি শাফেয়ী হয় তাহলে ছেলেও শাফেয়ী হয়। যে কারণে এইভাবে মাযহাবের অনুসরণ করা শিরক ও কুফর হয়েছে। [আমাদের মাযহাব কি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত?, পৃষ্ঠা-২২, লেখক-মুহাম্মদ ইকবাল বিন ফাখরুল]

মাযহাব অনুসারীদের হত্যা করতে হবে?

"যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট এক ইমামের তাকলীদকে ওয়াজিব করে নেবে তাকে তাওবা করানো হবে, অন্যথায় হত্যা করতে হবে। [অধ্যাপক ডক্টর রঈসুদ্দীন সম্পাদিত 'চার মাযহাবের নির্দিষ্ট কোনো এক মাযহাবের অনুসরণ করতে মুসলিম কি বাধ্য?, পৃষ্ঠা, ৪৩, শায়েখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম সম্পাদিত 'মুসলিম কি চার মাযহাবের কোনো একটির অনুসরণে বাধ্য?, পৃষ্ঠা, ৩২]

মাযহাব চারটি হয়েছে জাল হাদীস মানার কারণে?

"মাযহাবী ভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দুর্বল অথবা জাল হাদীসের ওপর ভিত্তি করে।" [পর্যালোচনা ও চ্যালেঞ্জ, লেখক-আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম, পৃষ্ঠা-৮]

হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা জাহান্নামী?

হানাফী মাযহাবের আলেম/উলামাগণের ইজমা [একমত হওয়া] মান্য করা হলে তারা বিদ'আত হানাফী মাযহাব পালনকারী জনগণ বিদ'আতী কাজ করে চলেছেন তাঁদের পরিণাম জাহান্নাম। {ফিকহে ইসলাম বনাম দ্বীন ইসলাম-১৭৯, লেখক-ইঞ্জিনিয়ার শামসুদ্দিন আহমাদ}

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কেমন ছিলেন?

'জন্মগত সূত্রে ইমাম আবু হানীফাহ ছিলেন শীআ। সকল মুহাদ্দিস শীআদেরকে ঘৃণা করত। তাই মুহাদ্দিস যাঁরা শীআ নন তাঁদের হাদীস তারা গ্রহণ করত না। ইমাম আবু হানীফাহ তাই মুহাদ্দিসগণের হাদীস গ্রহণ করেননি। আর এ জন্য তাঁর হাদীসের জ্ঞান ছিল খুবই নগণ্য। [আব্দুর রউফ রচনাবলী-১, পৃষ্ঠা-৯১]

"ইমাম আবু হানীফা ও ফিকহের প্রতিষ্ঠাতা আবু হানীফা এক নয়। কারণ ফিকহের উদ্দেশ্য সৎ ছিল না, ফিকহের উদ্দেশ্য হলো মানুষের শয়তানী ইচ্ছাকে পূর্ণ করা এবং সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গে রায়কে বাস্তবায়িত করা।"[মাওলানা আব্দুর রউফ রচনাবলী-১, পৃষ্ঠা-২২৩, লেখক-মাওলানা আব্দুর রউফ, সাবেক আমীর আহলে হাদীস তাবলীগে ইসলাম]

তাবলীগের ব্যাপারে ধারণা!

তাবলীগ জামাত শিরকজনিত আকীদার জালে আবদ্ধ এক ফেরকা, এদের নিসাবী কিতাব কোরআন ও সহীহ হাদীস পরিপন্থী জাল ও যয়ীফ হাদীসে ভরপুর। তাবলীগী নিসাবের কিতাবে জাল হাদীস ও কিচ্ছা-কাহিনী এবং বিভিন্ন শিরকী কথা ছাড়া আর কিছুই নেই। কোরআন ও সহীহ হাদীসের দু-একটা কথা থাকলেও সেসবের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। {সহীহ আকীদার মানদণ্ডে তাবলীগী নিসাব-লেখক মুরাদ বিন আমজাদ}

নামায তরককারীর হুকুম কী?

নামায তরককারী মুরতাদ। [জামাআতে সালাত ত্যাগকারীর পরিণাম-২৭, লেখক-খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান, আত-তাওহীদ প্রকাশনী]

তার মালিকানা ক্ষুণ্ন হয়। [প্রাগুক্ত-২৭]

সালাত পরিত্যাগকারী আত্মীয়-স্বজনের উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। [প্রাগুক্ত-২৮]

বেনামাযীর জন্য মক্কা-মদীনার সীমানায় প্রবেশ নিষিদ্ধ। [প্রাগুক্ত-২৮]

সালাত পরিত্যাগকারীর জবেহকৃত পশুর গোশত ভক্ষণ হারাম। [প্রাগুক্ত-২৯]

মৃত্যুর পর তার জানাযা পড়া যাবে না। [প্রাগুক্ত-২৯]

সালাত ত্যাগকারীর জন্য মুসলিম মহিলা বিবাহ করা হারাম। [প্রাগুক্ত-৩০]

রমাযানে রাত জেগে কোরআন তিলাওয়াত

'রমাযান মাসে ক্বারীগণের রাত জেগে কোরআন পাঠ করা, যা সলফে সালেহীনদের কাজ ছিল না। এটা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিক্ষা ছিল না। [মৃত ব্যক্তির নিকট কোরআন পাঠের সওয়াব পৌঁছে কি?, লেখক-খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান-৩৯]

এ রকম আরো অনেক জঘন্য আকীদা ও বিশ্বাস রয়েছে তাদের প্রকাশিত বই এবং ভিডিওতে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের দেশের সরলপ্রাণ ধর্মপ্রাণ মানুষদের তাদের প্রতারণা ও ধোঁকা থেকে হেফাজত করুন।

মুবাল্লিগ ভাইদের প্রতি হযরতজির হেদায়াত-৮

মুফতী শরীফুল আজম

বাইআতে ইতাআত :

অখণ্ড ভারতে দুজন মুবাল্লিগ নবীজি (সা.)-এর রওজা পাক থেকে ইঙ্গিত পেয়ে দাওয়াতের মেহনত চালু করেন। একজন হলেন হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.), অন্যজন হলেন হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)। উভয়ের জীবনীতে এ কথা পাওয়া যায় যে কাশফের মাধ্যমে তাঁরা নবীজি (সা.)-এর কাছ থেকে বিশেষ মেহনতের নির্দেশ পেয়েছেন। তাঁদের রেখে যাওয়া মেহনতের ধারক-বাহক বর্তমান উলামায়ে দেওবন্দ। মাসলাকের বিবেচনায় দেওবন্দওয়ালারা প্রসিদ্ধ চার তরীকার সমন্বয়ক হলেও চিশতীয়া ভাব তাঁদের মাঝে প্রবল। বিশুদ্ধ আকীদা, ইত্তিবায়ে সুন্নাত আর সঠিক কর্মপন্থার মাধ্যমে তাবলীগের মেহনতকে তাঁরা এমন পরিশুদ্ধ রূপে তুলে ধরেছেন যে বিশ্ববাসীর কাছে তা সমানভাবে সমাদৃত হয়েছে। চার মাযহাবের লোক এতে অংশ নিয়েছে।

ভারত ভেঙে পাকিস্তান পরে বাংলাদেশ হলেও বিশ্বের সকল দেশের মানুষের কাছে ভারতবর্ষের তাবলীগ অনুসরণীয়। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান এই তিন দেশের মেহনত সারা পৃথিবীর মুবাল্লিগদের জন্য রোল মডেল হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমার কারণে বাংলাদেশের গুরুত্ব সকলের নজরে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। উলামায়ে দেওবন্দের তত্ত্বাবধানে মাদরাসাকেন্দ্রিক গড়ে ওঠে তিন দেশের তিন মারকায। কাকরাইল, নিযামুদ্দীন ও রায়ভেন্ড মারকাযের জমি মূলত সংলগ্ন মাদরাসার নামে ওয়াক্‌ফকৃত। এ হিসেবে তাবলীগের মূল যদি হয় নিযামুদ্দীন তবে নিযামুদ্দীনের মূল হচ্ছে দেওবন্দ। বলতে গেলে খানকাহ ও মাদরাসাই হচ্ছে এই মেহনতের সূতিকাগার। আগামীতে তাদের হাতেই এটা নিরাপদ।

যে পথ ধরে এই মেহনত আজ বিশ্ব জয় করেছে তা হলো বড়দের নাহাজ বা কর্মপন্থা হুবহু অনুসরণ। এর মাঝে পরিবর্তন আনার চেষ্টা সকল সাফল্যকে ম্লান করে দিতে পারে। এখানে নতুন কোনো বিষয় চালু করা বড় খেয়ানত হিসেবে গণ্য হবে। ইতাআত, ইতাআত বলে যে আওয়াজ তোলা হচ্ছে, তা সন্দেহজনক। ইতাআতের সাথী, ইতাআতের জামা'আত বা ইতাআতের বাইআত–এগুলো সব নতুন পরিভাষা। ইতিপূর্বে তাবলীগের মাঝে এগুলো ছিল না। বেশ কয়েক বছর ধরে খাস খাস মজলিসে ইতাআতের গুরুত্ব বোঝাতে জোরালো বয়ান চলছে। ইতাআতের পরীক্ষার জন্য সকলকে প্রস্তুত করা হচ্ছে। অবস্থাদৃশ্যে মনে হয় ছয় সিফাতের মাঝে নতুন নম্বর যোগ করার পরিকল্পনা চলছে। ইতাআতের সাথীরা নতুন এক বাইআতে আবদ্ধ হচ্ছে, যার বৈশিষ্ট্য তিনটি।

এক. বর্তমান আমীরের হাতে বাইআত হওয়া ওয়াজিব।

দুই. তাঁর বাইআত অস্বীকারকারী বাগী।

তিন. যে কেউ তাঁকে কতল করে দিতে পারবে।

ইতাআতের সাথীদের পক্ষ থেকে এযাবৎ যে কয়টি বই প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে তার অন্যতম হচ্ছে "ভুলগুলো কি আসলেই ভুল"। মাওলানা মুফতী আতাউর রহমান গং সম্পাদিত উক্ত বইয়ের মাঝে বর্তমান আমীরের বাইআতের বৈশিষ্ট্য এভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

"প্রিয় পাঠক, সহীহ আকীদা রাখেন এমন পীরের কাছে ইসলাহের জন্য বাইআত হওয়ার তরীকাগুলো সময়ের প্রেক্ষিতে তৈরি হওয়া জায়েয তরীকা, আর আমলের ওপর যে বাইআত নেওয়া হয় আমাদের আকাবীর হযরত উলামায়ে কেরাম এই বাইআতকে মুস্তাহাব বা সুন্নাত বলে থাকেন। কেননা অনেক সাহাবা থেকে আল্লাহর নবী আমলের ওপর বাইআত নিয়েছেন। কিন্তু বেশকম এখানে এতটুকু যে নবী ও নবীর পরবর্তী খোলাফায়ে রাশীদিনের জমানায় বাইআত একজনই নিতেন। যিনি আমলের ওপর বাইআত নিতেন, তিনিই জিহাদের ওপরও বাইআত নিতেন। বাইআত গ্রহণকারী আমীর একজনই থাকতেন। আর সে বাইআতের হুকুম ফিকহী পরিভাষায় মুস্তাহাব বা সুন্নাত নয়, বরং ওয়াজিব। আর যারা শরয়ী ওযর ছাড়াই আমীরের হাতে বাইআত হবে না তাদের বলা হয়

বাগী। তাবলীগের আমীরগণ সাহাবাওয়ালা সেই বাইআত আমভাবে যিন্দা করার ফিকির ও মেহনত করছেন।" (ভুল.....ভুল পৃ. ৬৩)

ঠিক তেমনিভাবে বর্তমানের অজিফাভিত্তিক শতধাবিভক্ত প্রচলিত বাইআতের পরিবর্তে সাহাবাওয়ালা বাইআত নেওয়া হচেছ, যা হক তালাশকারী আহলে ইলম সকলের কাছেই স্পষ্ট (ভুলগুলো কি আসলেই ভুল-৪৯)

ইতাআতের সাথীদের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনকারী কাকরাইল মারকাযের দীর্ঘদিনের মুকিম শায়খ আব্দুল্লাহ মনসুর কাসেমী (তাহকীক করে জানা গেছে তিনি দাওরায়ে হাদীস পাস করা মাওলানা নন এবং নিজেও তা স্বীকার করে নিয়েছেন) তাঁর রচিত পুস্তিকায় লিখেছেন,

جو بھی انکی مخالفت کریے گا وہ باغی وہ فتنین شمار ہوگا جو واجب القتل شمار کئے جائینگے شریعت مطہرہ میں قرآن وحدیث کی روشنی سے بالکل صاف بات ہے اوراس حکم کو پورا کرنے کے لیے کسی اسلامی حکومت کی ضرورت نہیں ہے تمام امت کے لیے یہ حکم ہے۔۔۔(امیر ہی سنت ہے ص ۱۶)

অর্থ : যে কেউ তাঁর (মাওলানা সা'দ সাহেবের) বিরোধিতা করবে সে বাগী ও ফিতনাকারী বলে গণ্য হবে, তাঁকে হত্যা করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে। শরীয়তে এটা কোরআন-হাদীসের আলোকে একদম পরিষ্কার কথা। আর এই হুকুম পুরা করার জন্য কোনো ধরনের ইসলামী হুকুমতের প্রয়োজন নেই। সমস্ত উম্মতের জন্য এই হুকুম। (আমীর হি সুন্নাত হায়-১৬)

কোরআন-সুন্নাহর আলোকে :

নবীজি (সা.) ২৩ বছর নবুওয়তির দায়িত্ব পালনের প্রথম তেরো বছর হলো মক্কীজীবন আর শেষ দশ বছর মাদানীজীবন। মক্কা শরীফে দাওয়াতের তরতীব ছিল এক রকম আর মদীনা শরীফে ছিল ভিন্ন রকম। মক্কায় থাকাকালীন জিহাদের হুকুম ছিল না। তখন বাইআত হতো শুধু ঈমান-আমল মজবুত করার ওপর। হিজরতের পর মদীনা শরীফে জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয়। মদীনা সনদের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। যোগ হয় জিহাদের বাইআত। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِير

অর্থ : যুদ্ধে অনুমতি দেওয়া হলো তাদের, যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। (সূরা হজ-৩৯)

মক্কায় মুসলমানরা কাফেরদের সীমাহীন জুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নবীজি (সা.)-এর কাছে যুদ্ধের অনুমতি চাইতেন। তিনি (সা.) বলতেন, সবর করো, তখনো যুদ্ধের অনুমতি হয়নি। অবশেষে নবীজি (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করতে বাধ্য হন। সঙ্গে ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)। মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় তিনি বললেন, এরা তাদের নবীকে বহিষ্কার করেছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য, এরই পরিপ্রেক্ষিতে মদীনায় পৌঁছার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এটা জিহাদের সর্বপ্রথম আয়াত।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ " :لَمَّا أُخْرِجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ :أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ، إِنَّا لِلَّهِ، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لَيَهْلِكُنَّ، فَنَزَلَتْ: (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) (الحج:٣٩) فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَكُونُ قِتَالٌ "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :فَهِيَ أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالِ (نسائى رقم الحديث ٣٠٨٥)

এর পর থেকে সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে জিহাদের বাইআত নেওয়ার ধারা শুরু হয়। চতুর্থ হিজরী শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সাহাবায়ে কেরাম মিলেমিশে পরিখা খনন করেন। নবীজি (সা.) তাদের উৎসাহ প্রদান করে বিভিন্ন দু'আ ও পঙ্‌তি আওড়াতে থাকেন।

عَنْ حُمَيْدٍ، سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ :خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الخَنْدَقِ، فَإِذَا المُهَاجِرُونَ، وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالجُوعِ، قَالَ

اللَّهُمَّ إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَهْ،
فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهْ

হে আল্লাহ! আখেরাতের
আরাম-আয়েশই প্রকৃত
আরাম-আয়েশ।
অতএব আপনি আনসার ও
মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করুন।

فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ:

প্রতি উত্তরে সাহাবায়ে কেরামও সুর ধরেন,

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا
عَلَى الجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا

আমরা সেই জাতি, যারা মুহাম্মদ

(সা.)-এর হাতে বাইআত হয়েছি, আমরণ জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার ওপর। (বোখারী শরীফ-২/৫৮৮, হা. ৪০৯৯)

ষষ্ঠ হিজরী জিলকদ মাসে সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধি। যেখানে একপর্যায়ে নবীজি (সা.) সাহাবাদের মাঝে জিহাদের বাইআতের এলান করেন। সকলে নবীজি (সা.)-এর হাতে এ কথার বাইআত গ্রহণ করেন যে আমরা যুদ্ধের ময়দান থেকে কোনো অবস্থাতেই পালায়ন করব না।

فدعا رسول الله ﷺ حينئذ الى المبايعة له على الحرب والقتال لاهل مكة، فروى انه بايعهم على الموت وروى انه بايعهم على الا يفر- (احكام القرآن للتهانوى ٢٣٢/٤)

বাইআতে রেজওয়ানের এ ঘটনা পবিত্র কোরআনে এভাবে উল্লেখ হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

অর্থ : যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর রয়েছে। অতএব যে শপথ ভঙ্গ করে (অর্থাৎ ইতাআত না করে বিরোধিতা করে) অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যই করে এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে আল্লাহ সত্বরই তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন। (সূরা আল-ফাত্হ-১০)

এ সকল আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায়, নবীজি (সা.) মদীনায় হিজরতের পর থেকে হিজাদ, কিতাল ও ইতাআতের বিশেষ বাইআত শুরু করেন, যা পূর্বে শুধু ঈমান ও আমলের বাইআতের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। তাবলীগের মুরব্বিগণ মক্কীজীবনের তরতীবে দাওয়াতের মেহনত চালু করেন, মাদানী তরতীবে নয়। তাঁরা ইসলাহী বাইআত নিতেন; কিন্তু জিহাদ বা ইতাআতের বাইআত নিতেন না।

খোলাফায়ে রাশেদীনের বাইআত :

নবীজি (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ত্রিশ বছর যাবত নবীজি (সা.)-এর নাহাজ বা কর্মপন্থা অনুযায়ী খেলাফত ব্যবস্থা চালু থাকে। চার খলিফা এবং হযরত হাসান (রা.)-এর ছয় মাস মিলিয়ে এই সময় পুরা হয়। এর মাঝে খলিফাতুল মুসলিমীনের হাতে ইতাআতের বাইআতের ধারা অব্যাহত থাকে। হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، قَالَ :حَدَّثَنِي سَفِينَةُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الخِلاَفَةُ فِي أُمَّتِي ثَلاَثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لِي سَفِينَةُ :أَمْسِكْ خِلاَفَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَخِلاَفَةَ عُمَرَ، وَخِلاَفَةَ عُثْمَانَ، ثُمَّ قَالَ لِي :أَمْسِكْ خِلاَفَةَ عَلِيٍّ قَالَ : فَوَجَدْنَاهَا ثَلاَثِينَ سَنَةً، قَالَ سَعِيدٌ : فَقُلْتُ لَهُ :إِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الخِلاَفَةَ فِيهِمْ؟ قَالَ :كَذَبُوا بَنُو الزَّرْقَاءِ بَلْ هُمْ مُلُوكٌ مِنْ شَرِّ الْمُلُوكِ.

অর্থ : আমার উম্মতের মাঝে খেলাফত ত্রিশ বছর পর্যন্ত থাকবে, অতঃপর রাজতন্ত্র চালু হবে। (তিরমিযী-২/৪৬)

মূলত হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর থেকে শুরু হয় উম্মতের মাঝে চরম ইখতিলাফ ও খলিফার বিরুদ্ধে বাগাওয়াতের ধারা। এরপর খেলাফত ব্যবস্থা দুর্বল হতে হতে ত্রিশ বছরের মাথায় সমাপ্ত ঘটে।

উম্মতের পাঁচ যুগ :

মুসনাদে আহমদের এক হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী মুসলিম জাতির ওপর পাঁচটি যুগ অতিবাহিত হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত গিয়ে ঠেকবে।

قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ": تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ تعمل فى الناس بسنة النبى، ويلقى الإسلام بجرانه فى الأرض، يرضى عنها ساكن السماء، وساكن الأرض، لا تدع السماء من مطر إلا صبته مدراراً ولا تدع الأرض من نباتها ولا بركاتها شيئاً إلا أخرجته (حديث صحيح رواه الإمام أحمد والبزار والطيالسى، وقال الهيثمى : ورجاله رجال الثقات "ورواه الطبرانى فى الأوسط من حديث حذيفة)

নবীজি (সা.) ইরশাদ করেন,

(১) তোমাদের দ্বীনের সূচনা হবে নবুওয়াত এবং রহমতের মাধ্যমে। যত দিন আল্লাহর ইচ্ছা হবে তোমাদের মাঝে সেটা বাকি থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সেটা উঠিয়ে নেবেন। (অতএব ৬৩ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করে নবীজি (সা.) ১১ হিজরী রবিউল আউয়াল মাসে দুনিয়া ত্যাগ করেছেন।)

(২) অতঃপর নবুওয়তের আদর্শের

ওপর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ধারাও আল্লাহ পাক যত দিন চান বাকি থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই ব্যবস্থা উঠিয়ে নেবেন। {নবীজি (সা.)-এর ওয়াফাতের পর ত্রিশ বছর এই খেলাফত বাকি ছিল}

(৩) এরপর শক্তিশালী বাদশাহী যুগ আসবে, আল্লাহ তা'আলা যত দিন চাইবেন এটা বাকি থাকবে। এরপর উঠিয়ে নেওয়া হবে। (৪১ হিজরী থেকে এই বাদশাহী যুগ শুরু হয়ে ১৩৩৮ হিজরীতে এসে খতম হয়)

(৪) অতঃপর স্বৈরাচার বাদশাহদের যুগ আসবে এবং একসময় আল্লাহ তা'আলা এর অবসান ঘটাবেন। (১৩৩৮ হি. ইংরেজদের হাতে উসমানী খেলাফতের পতনের পর থেকে মুসলমানদের সাম্রাজ্য ছোট ছোট দেশে বিভক্ত হয়ে স্বৈরশাসনের বর্তমান অবস্থানে আছে)

(৫) সর্বশেষ জমানায় পুনরায় খেলাফতে রাশেদার যুগ ফিরে আসবে, যা পুরোপুরি নবুওয়তের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। ইসলামী জীবনব্যবস্থা চালু হবে। খেলাফতের এই ব্যবস্থাপনায় আসমান-জমিনের অধিবাসীগণ আনন্দিত হবে। খুব বৃষ্টিপাত হবে। ফলে জমিনের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং বরকত প্রকাশ পাবে। (মুসনাদে আহমদ, হা. ১৮৩৬৬)

চার খলিফার যুগ হচ্ছে প্রকৃত অর্থে খেলাফতের যুগ। এর পরের থেকে শুরু হয় রাজা-বাদশাহদের শাসন। তবে উমাইয়া, আব্বাসী ও উসমানী শাসকদের যুগকে দ্বিতীয় স্তরের খেলাফত হিসেবে গণ্য করা হয়। যেহেতু তাদের আমলে মুসলমানদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল। মুসলিম সাম্রাজ্যের দাপট ছিল, ইসলামী আইন-কানুন চালু ছিল। অমুসলিম রাষ্ট্র মুসলমানদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের সাহস দেখাত না। এ সকল কারণে তৎকালীন শাসকদের খলিফা বলা হতো, যদিও তাদের সকল কর্মকাণ্ড শরীয়ত সম্মত ছিল না। শুধু রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মানুষ তাদের হাতে ইতাআতের বাইআত হয়ে থাকত। ইসলাহী বাইআতের সম্পর্ক তাদের সাথে করা হতো না।

বিভক্ত বাইআত :

খোলাফায়ে রাশেদীনের যে গ্রহযোগ্যতা ছিল, তাদের প্রতি মানুষের যে ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল তার প্রধান কারণ হলো নবীজি (সা.)-এর আদর্শে আদর্শবান হওয়া। তাই মানুষ তাদেরকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণীয়-অনুকরণীয় মনে করে চলত। নিজের ইসলাহ ও ইতাআত দোনটার সম্পর্ক তাদের সাথে রাখত।

কিন্তু তাদের সোনালি যুগের পর রাজা-বাদশাহদের কর্মকাণ্ড দেখে মানুষ তাদের কাছ থেকে আখলাক শেখা বা আত্মশুদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে ভরসা পেত না। শুধু বাধ্য হয়ে তাদের ইতাআত করে রাষ্ট্র পরিচালনায় শৃঙ্খলা বজায় রাখত। আর ইসলাহী সম্পর্ক কোনো মাশায়েখের সাথে গড়ে তুলত। কাজেই মুসনাদে আহমদে উল্লিখিত হাদীসের ভাষ্য মতে মুসলিম উম্মতের তৃতীয় যুগের রাজা-বাদশাহদের যুগে এসে বাইআতের ধারা বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইতাআতের বাইআত চলে রাজা-বাদশাহদের হাতে আর ইসলাহী বাইআত চলতে থাকে অবশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন, ফুকাহা, মুহাদ্দিস এবং সুফিয়ায়ে কেরামের হাতে।

ইতাআতের বাইআত বন্ধ :

দ্বিতীয় স্তরের খলিফাদের যুগ শেষ হয় ১৩৩৮ হিজরী উসমানী সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে। এ সময় অর্ধ জাহানব্যাপী বিস্তৃত মুসলিম রাষ্ট্র ছোট ছোট দেশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। খলিফাতুল মুসলিমিন বলতে আর কেউ না থাকায় খলিফার হাতে ইতাআতের বাইআতের ধারা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। বাকি থাকে শুধু সুফিয়ায়ে কেরামের হাতে ইসলাহী বাইআতের ধারা। এটা হাদীসে বর্ণিত চতুর্থ যুগ, বা বর্তমানে চলমান। এ পর্যায়ে এসে রাষ্ট্র ক্ষমতা মুসলমানদের হাত ছাড়া হলেও মুসলিম জাতির ঈমান-আমল বাঁচানোর উদ্দেশ্যে পীর-মাশায়েখগণ বাইআতের এক অংশ ধরে রাখেন। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া ইসলাম আজ সারা বিশ্বে যেভাবে টিকে আছে এর পেছনে ধর্মীয় নেতাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এর মাঝে আছেন ফুকাহায়ে কেরাম, মুহাদ্দিসীন, মুফাস্সীরিন, মুজাদ্দিদীন, মুজাহিদীন এবং আউলিয়ায়ে কেরাম। এক কথায় বলতে গেলে এটা মাশায়েখের অবদান, বিশেষ করে উলামায়ে দেওবন্দের এখলাসের ফসল।

শেষ জমানার বাইআত :

মুসনাদে আহমদের হাদীস মতে শেষ জমানায় আবার খেলাফতে রাশেদার ব্যবস্থা চালু হবে। আর তা হবে হযরত মাহদী (রহ.)-এর খেলাফত। খলিফাতুল মুসলিমীন হিসেবে সকলে তাঁর হাতে বাইআত হবে। চালু হবে

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা ইতাআতের বাইআতের ধারা। তার বাইআত হবে ওয়াজিব। বিরোধিতাকারী হবে বাগী। তার মোকাবেলাকারীকে কতল করা হবে। এটাই খলিফা তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের বাইআতের হুকুম।

اجمعت الامة على وجوب عقد الامامة وعلى ان الامة يجب عليها الانقياد (طحطاوى على الدر ١/٢٣٨)

অর্থ : ইজমায়ে উম্মত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে খলিফা নিযুক্ত করা ওয়াজিব এবং উম্মতের ওপর ওই খলিফার আনুগত্য ওয়াজিব। (তাহতাবি আলাদ্দুর-১/২৩৮)

وشرعا هم الخارجون عن الامام الحق بغير حق فلو بحق فليسوا ببغاة (رد المحتار ٤/٢٦١)

অর্থ : শরীয়তের দৃষ্টিতে বাগী বলা হয় যারা বৈধ খলিফার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে। আর যদি ন্যায়সংগত কারণে হয় তাহলে তারা বাগী নয়। (রদ্দুল মুখতার-৪/২৬১)

তাবলীগের আমীর এ ধরনের খলিফা নন, কাজেই তাঁকে আমীর না মানলে বাগী আখ্যা দিয়ে কাউকে হত্যা করার ফয়সালা দেওয়া যাবে না।

তাবলীগের আমীর কি খলিফা :

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান যিনি হন তাঁকে খালিফাতুল মুসলিমীন বলা হয়ে থাকে। জনগণের জন্য যাঁর হাতে ইতাআতের বাইআত ওয়াজিব। তাবলীগের প্রয়াত তিন আমীর বা হযরতজি এ ধরনের খলিফা হওয়ার দাবি কখনোই করেননি। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তাবলীগের উদ্দেশ্য নয়। এ কথার মাঝে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কাজেই তাবলীগের আমীরের বাইআতকে ওয়াজিব বলা, না হলে বাগী বলা সঠিক নয়। অথচ বর্তমান ইতাআতের সাথীদের বক্তব্য হলো তাদের বিশ্ব আমীর খলিফাতুল মুসলিমীনের মর্যাদা রাখেন। মুফতী আতাউর রহমান গং সম্পাদিত পুস্তিকায় লেখা হয়েছে–

"মুসলিম জামাতের প্রধান ব্যক্তি, যাঁকে খলিফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সংক্ষেপে খলিফা, আমীর বা ইমাম বলা হয়ে থাকে, এই আমীর বা খলিফার জায়গায় নির্দিষ্ট কোনো আমীরবিহীন আহলে শুরা কিংবা আহলে শুরাদের মধ্যে পালাবদল আমীরের তরতীব ইসলামে নেই। সুতরাং মুহতারাম মাওলানা কেন ইসলামিক তরীকা ছেড়ে অনৈসলামিক তরীকা গ্রহন করবেন। কেন তিনি সুন্নাত ছেড়ে বিদ'আত মানবেন। কেন তিনি সীরাত ছেড়ে বিজাতিদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এই আলমী শুরা মানতে যাবেন। (ভুলগুলো কি আসলেই ভুল-১৫২)

অর্থাৎ তিনি খলিফাতুল মুসলিমীন হিসেবে আছেন তাই আলমী শুরা মানবেন না। কিন্তু খলিফার জন্য তো ইসলামী রাষ্ট্র লাগে উনার রাষ্ট্র কোথায়? উক্ত পুস্তিকায় আরো লেখা হয়–

সুতরাং শরীয়তের মেজাজ এবং নবী ও সাহাবাওয়ালা খেলাফত ও ইমারতের হেকমত প্রমাণ করে তাবলীগ জামাত ও তাবলীগ জামাতের আমীর এবং বর্তমান আমীর মুহতারাম হাফেজ মাওলানা সা'দ সাহেব (দা. বা.) শরয়ী আমীর। (ভুলগুলো কি আসলেই ভুল-১৯৭)

এখানে আরো স্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া হলো যে ইতাআতি ভাইদের আমীর সাহেব হলেন শরয়ী আমীর তথা খলিফাতুল মুসলিমীন। কাজেই তাঁর ইতাআত ওয়াজিব অন্যথায় মৃত্যুদণ্ডের সাজা নির্ধারিত। ছয় সিফাতের তাবলীগের মাঝে এ সকল কথা একেবারে নতুন। এর সাথে একমত হতে না পেরেই আজ তাবলীগের জিম্মাদার পর্যায়ের মুরব্বি থেকে নিয়ে সাধারণ সাথীরা বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

তাবলীগ ও খেলাফত :

শেষ জমানায় হযরত মাহদী (রহ.)-এর খেলাফতের পূর্বে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দীর্ঘ এই সময়ে ইসলামের হেফাজতের যে ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাখা হয়েছে তা হলো তাজদীদ। প্রতি শতাব্দীতে এক বা একাধিক মুজাদ্দিদের মাধ্যমে মুসলমানদের সংশোধনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)সহ উলামায়ে দেওবন্দের প্রচেষ্টায় চলমান তাবলীগের মেহনতও এমনই একটি তাজদীদের কাজ। হযরতজির ভাষায় এটা تجديد ايمان তাজদীদে ঈমানের মেহনত। খেলাফত প্রতিষ্ঠার মেহনত নয়। মানুষের ঈমান যখন দুরস্ত হয়ে যাবে তখন আমল করা সহজ হবে। হযরত মাহদীর (রহ.) হাতে বাইআতের ডাক এলে তাঁর ওপর আমল করাও সহজ হবে। সময়ে আগে খেলাফত প্রতিষ্ঠা বা বিশ্বময় বিপ্লব ঘটানোর কথা বলা হলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। উল্টা তাবলীগের

বদনাম হবে।

যেমন হিযবুত তাহ্‌রীর খেলাফত ফেলাফত বলে নিষিদ্ধ হয়েছে। জামায়াত-শিবির বিপ্লব বিপ্লব বলে অঘোষিতভাবে নিষিদ্ধ হয়ে আছে।

আজকাল ইতাআতের সাথীদের কথাবার্তায় মনে হয় তাবলীগের একটা বদনাম তারা করতে চাচ্ছেন। মুফতী আতাউর রহমান গং সম্পাদিত "ভুলগুলো কি আসলেই ভুল" নামক পুস্তিকায় লেখা হয়েছে, "শুধু বলতে চাই, মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) থেকে শুরু করে এই সিলসিলার সব আমীর হযরতগণ বিশ্বময় বিপ্লব ঘটানো ও সাহাবাওয়ালা খিলাফত ও যিন্দেগি নিয়ে চলার গভীর যে মেজাজ ধারণ করেছিলেন সে মেজাজকে নিয়েই মুহতারাম মাওলানা সা'দ সাহেব (দা. বা.) চলছেন। (ভুল.....ভুল-২৪)

অথচ বিশ্বময় বিপ্লব ঘটানো বা খেলাফত প্রতিষ্ঠার কথা ইতিপূর্বে তাবলীগের মাঝে শোনা যায়নি। কিছুদিন আগে আইএস তথা ইসলামী স্টেট নামে সিরিয়াতে যা কিছু হলো তাকে জঙ্গিবাদ বানিয়ে ইসলামের বদনাম করার চেষ্টা হয়েছে বিশ্বব্যাপী। এখন আবার তাবলীগকে খেলাফত প্রতিষ্ঠার মেহনত হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা হচ্ছে। এর পেছনে কোনো চক্রান্ত কাজ করছে কি না ভেবে দেখতে হবে।

তাবলীগ ও জিহাদ :

তাবলীগে জিহাদ আছে কিতাল নেই। এটা জিহাদের একটা প্রকার, যেখানে অস্ত্র হাতে নিয়ে কিতাল করতে হয় না। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ : যারা আমার পথে সাধনার আত্মনিয়োগ করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। (আনকাবুত ৬৯)

উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, জিহাদের আসল অর্থ ধর্মের পথে বাধা-বিপত্তি দূর করার জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা। কাফের ও পাপিষ্ঠদের পক্ষ থেকে আগত বাধা-বিপত্তি এবং প্রবৃত্তি ও শয়তানের পক্ষ থেকে আগত বাধা-বিপত্তি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে জিহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকার হচ্ছে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। উভয় প্রকার জিহাদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে ওয়াদা করা হয়েছে যে যারা জিহাদ করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। (মাআরেফুল কোরআন)

হাদীস শরীফেও এ ধরনের জিহাদের কথা পাওয়া যায়, যেখানে কিতাল নেই।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ " :نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ، لَا قِتَالَ فِيهِ :الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

অর্থ : হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! মহিলাদের ওপর জিহাদ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাদের ওপর এমন জিহাদ আছে, যাতে কিতাল নেই। আর তা হচ্ছে হজ এবং ওমরাহ। (ইবনে মাজাহ, হা. ২৯০১, বোখারী-১৫২০, ২৮৭৫)

حَدَّثَنِي فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ :أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ، مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَأَنْفُسِهِمْ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ، وَيَدِهِ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ

অর্থ : মুজাহিদ ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহর হুকুম পালনে তার নফসের সাথে জিহাদ করে। (সহীহে ইবনে হিব্বান, হা. ৪৮৬২)

হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এমন জিহাদই চালু করে গেছেন যাতে কিতাল নেই। অর্থাৎ নফস ও শয়তানের সাথে জিহাদ। একবার তিনি মেওয়াতের বিভিন্ন এলাকায় রমাযান মাসে সফর করেন। উদ্দেশ্য রমাযানের শেষ দশকে সকল মসজিদে ই'তিকাফের সুন্নাত জিন্দা করা। সফর থেকে ফিরে এসে তিনি অভ্যাসমাফিক হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-এর কাছে একটি পত্র লেখেন। যার সারকথা হলো, ই'তিকাফের এই সুন্নাত প্রত্যেক মসজিদে জিন্দা করা এবং প্রত্যেক ঘর থেকে একজন পুরুষ তাবলীগের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যাওয়ার মেহনত চালু করার জন্য আমার এই সফর। অতঃপর তিনি লেখেন,

بندہ کے نزدیک اصل جہاد یہی ہے، جہاد اور چیز ہے قتال اور چیز ہے (سوانح مولانا انعام الحسن ۱/۵۶)

অর্থ : আমার মতে এটাই আসল জিহাদ, জিহাদ এক জিনিস আর কিতাল আরেক জিনিস। (সা. মা এ. ১/৫৬)

বোঝা গেল, তাবলীগে জিহাদ আছে কিতাল নেই। অথচ বর্তমান

ইতাআতের সাথীরা সম্পূর্ণ এর উল্টো কথা প্রচার করছেন। মুফতী আতাউর রহমান গং সম্পাদিত পুস্তিকায় লেখা হয়েছে,

"হযরত ইলিয়াস (রহ.) বলতেন, ফকিহুন নফস হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) ছিলেন জমানার মুজাদ্দিদ। আমার এই তাজদিদি কাজ (অর্থাৎ মুসলমানদের এক জামাত এক আমীর ও পূর্ণ এক বাইআত এবং ওই জামাত ও আমীরের বর্তমান জমানার প্রধান দায়িত্ব বা কাজ দীর্ঘ একটা সময় দাওয়াত ও তাবলীগের লাইনে উম্মতের ওপর আমভাবে দাওয়াতি জামাত পাঠিয়ে পূর্ণরূপে সাহাবাওয়ালা আদর্শ এবং খেলাফতের আদর্শ জিন্দা করার পরিবেশ তৈরি করা। সাহাবাদের মতো জিহাদের ময়দানে জান দেওয়ার পাগল তৈরি করা ইত্যাদি) উনারই তাজদিদ। (ভুলগুলো কি আসলেই ভুল-৪৯)

এ কথা হযরতজি (রহ.) কোথায় বলেছেন তার রেফারেন্স দেওয়া হয়নি। তা ছাড়া বন্ধনীর ভেতর যে কথাটি লেখা হয়েছে তা সম্পূর্ণ বানোয়াট।

সামনে অগ্রসর হয়ে আরো লেখা হয়,

আমাদের করণীয় : "..... এক আমীর, এক মারকায এবং আলমী এই আমীর ও মারকাযের অধীন যেখানে মুসলমান সেখানে শাখাগত মারকায ও আমীর বা গভর্নর তৈরি হবে। এক উম্মত এক কাজ করে যাবে। একতা ও জামাতবদ্ধতা এবং আমীরের ইতাআত পুরোপুরি জিন্দা হবে এবং প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধভাবে আমীরের আদেশে কাফের ও কুফুরির বিরুদ্ধে দাওয়াতের একটা পর্যায়ের নাম কিতাল, সেই কিতালে ঝাঁপিয়ে পড়ে শহীদ হয়ে জান্নাত ক্রয় করবে। ..... এই ভাবে সমস্ত মুসলমান ঈমান ও আমল নিয়ে এবং এক মারকায ও এক আমীরের ইতাআতে থেকে জামাতবদ্ধভাবে দাওয়াত ও জিহাদের কাজ চালিয়ে যাবে।" (ভুলগুলো কি আসলেই ভুল-১৯৯)

মুবাল্লিগ ভাইয়েরা! আপনারাই বলুন এটা কি হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর তাবলীগ? তাবলীগকে কোন পথে নিয়ে যেতে চাচ্ছে আমাদের ইতাআতের সাথীরা, সেদিকে একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। সরকারি বাহিনীর পাহারায় দিল্লিতে বসে কিভাবে খেলাফত, ইতাআত, জিহাদ, কিতালের প্রস্তুতি সম্ভব হচ্ছে। কারা এগুলো করাচ্ছে? বিশ্বের দরবারে তাবলীগের মেহনতকে জিহাদ বা ইসলামী স্টেট প্রতিষ্ঠার বিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত করা নিরাপদ কি না? এভাবে চলতে থাকলে তাবলীগকে জঙ্গিবাদের তকমা লগিয়ে সারা বিশ্বে এই মেহনত বন্ধ করতে আর কোনো বাধা থাকবে কি?

তাবলীগ ও মাহদী বাহিনী :

আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অন্যতম আকীদা হচ্ছে,

خلافة المهدىؓ فى آخر الزمان حق

অর্থ : শেষ জমানায় হযরত মাহদী (রহ.)-এর খেলাফত সত্য। কাজেই এতে কোনো সন্দেহ নেই যে হযরত মাহদী আগমন করবেন। তাঁর খেলাফতের অপেক্ষায় উম্মত প্রথম শতাব্দীর পর থেকে প্রহর গণনা করছে। কেননা তাঁর খেলাফত ছাড়া পৃথিবীতে জুলুমের প্রতিকার সম্ভব হবে না। ইনসাফ ফিরে আসবে না। কিন্তু আসল মাহদী আর নকল মাহদীর পরিচয় উম্মতের কাছে তুলে ধরবে কে? নিকট অতীতে নকল মাহদীর মুখোশ উন্মোচন করেছে উলামায়ে দেওবন্দ। তাই উলামায়ে দেওবন্দ ইসলাম দুশমনদের মাথাব্যথার কারণ। সাধারণ মুসলমানদেরকে উলামায়ে কেরাম থেকে দূরে সরাতে না পারলে নকল মাহদীরা আগামীতেও ধরা পড়ে যাবে। কাজেই মুসলমান জনসাধারণকে উলামাবিদ্বেষী করে গড়ে তোলার বিভিন্ন অপকৌশল লক্ষ করা যায়। কখনো কাদিয়ানী বা মওদুদীবাদের মাধ্যমে কখনো আহলে হাদীসের মাধ্যমে আবার কখনো ডা. জাকির নায়েকের বেশে। তাবলীগের মাঝেও এই ফেতনা প্রবেশ করেছে। ইতাআতের সাথীদের মাঝে অনেক ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় উলামাবিদ্বেষ পরিলক্ষিত হচ্ছে। শোনা যচ্ছে, তারা নাকি হযরত মাহদীর বাহিনীতে যোগ দিতে যাচ্ছে। মনে করুন, এই মুহূর্তে যদি ইতাআতের আমীর সাহেব কাউকে হযরত মাহদী (রহ.) বলে ঘোষণা করেন আর সকল উলামায়ে কেরাম কোরআন-সুন্নাহর আলোকে তাঁকে নকল মাহদী বলে চিহ্নিত করেন তাহলে ইতাআতের সাথীরা কী সিদ্ধান্ত নেবেন? মনে রাখতে হবে, হযরত মাহদী (রহ.) বা হযরত ঈসা (আ.) কিংবা দাজ্জাল সম্পর্কে হাদীস শরীফে বিস্তারিত বিবরণ আছে। উলামায়ে দেওবন্দ ওই সকল হাদীস যুগ যুগ ধরে সংরক্ষণ করে আসছেন। অতএব উলামায়ে দেওবন্দকে বাদ দিয়ে আসল মাহদীর সন্ধান পাওয়া যাবে না। হযরত মাহদী (রহ.)-এর খেলাফত নিয়ে বিস্তারিত আগামীতে লেখা হবে ইনশাআল্লাহ।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

ফিকহে ইসলামী ও গাইরে মুকাল্লিদ-১

মূল : মুফতী শুআইবুল্লাহ খান মিফতাহী
ভাষান্তর : মুফতী আতীকুল্লাহ

ফিকাহশাস্ত্রের হাকীকত ও প্রয়োজনীয়তা :

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির ওপর বড় দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন। মানবজাতি যেন সত্যের দিশা পায়, হেদায়াতের মহাসড়কে যেন চির অবিচল থাকতে পারে তাই নাজিল করেছেন পথনির্দেশনামূলক আহকাম ও সংবিধান। তার জন্য নির্বাচন করলেন কতক পবিত্র মানবাত্মা, যাঁদেরকে আম্বিয়ায়ে কেরাম বলা হয়। যাঁদের কাজকর্মে, যাঁদের রীতি-নীতিতে, যাঁদের স্বভাব-চরিত্রে ফুটে ওঠে ঐশী বাণী ও আসমানী আহকামের দ্বীপ্তিময় প্রতিচ্ছবি। আল্লাহ তা'আলা যাঁদের আচার-আচরণ, চাল-চলন, সুরত ও সিরাতের মাধ্যমে স্বীয় আহকাম ও ফরমানসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়েছেন। মানবজাতির হেদায়াতের জন্য একদিকে যেমন ছিল আল্লাহপ্রদত্ত আহকাম ও সংবিধানসমূহ, অন্যদিকে ছিল নবীদের আলাপ-আলোচনা, বিচার-বিশ্লেষণ, আকওয়াল ও আমাল, কথা ও কর্ম এবং চাল-চলন ও আচার-ব্যবহারের উত্তম আদর্শ। খাতেমুন নবীয়্যিন হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল ও বার্তাবাহক হিসেবে পাঠালেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর একদিকে যেমন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সর্বশেষ ও চিরস্থায়ী কালাম কোরআন মজীদ নাজিল করেন, অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আকওয়াল ও আমাল, মুখনিঃসৃত বাণী ও কাজকর্ম এবং হযরতের আখলাক-চরিত্র ও জীবনযাপনের মাধ্যমে কালামে রাব্বানী ও আহকামে হাক্কানী তথা খোদায়ী কালাম ও আল্লাহপ্রদত্ত আহকামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তার প্রয়োগিক রূপ বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং শরীয়তের আহকামের ওপর চলার পথ ও পদ্ধতিকে সহজ করে দিয়েছেন। এমনিভাবে আমাদের হেদায়াতের জন্য দুটি জিনিস মৌলিক উৎস হিসেবে চিরস্বীকৃতি পেয়ে যায়। এক. কোরআন মজীদ, দুই. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত।

ইসলামের দুই মৌলিক উৎস :

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللهِ ، وسنّة رسولِهِ

"তোমাদের মাঝে দুটি বিষয় আমি রেখে গেলাম। যত দিন তোমরা এ দুটো মাযবুতির সাথে আঁকড়ে ধরে রাখবে, তত দিন পথচ্যুত, গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হবে না। এক. আল্লাহ তা'আলার কিতাব। দুই. আমার সুন্নাত ও আদর্শ।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ৩১)

অন্য এক হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত জাবের (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَإِنَّ أَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"সর্বোৎকৃষ্ট কালাম আল্লাহ তা'আলার কালাম এবং সর্বোত্তম তরীকা ও পদ্ধতি একমাত্র মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তরীকা ও পদ্ধতি। পক্ষান্তরে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ (দ্বীনে) নতুন আবিষ্কার (বিদ'আত), আর প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা। (মুসনাদে আহমদ)

উপরিউক্ত হাদীস শরীফে এক আল্লাহ তা'আলার কালাম ও দ্বিতীয়ত তরীকায়ে মুহাম্মদী তথা সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে উল্লেখ করে বাকি সবগুলোকে নিকৃষ্ট বলা হয়েছে। এখানে কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফকেই ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ইজমায়ে উম্মত : কোরআন-হাদীস দ্বারা ইসলামের আরো একটি উৎসের খোঁজ পাওয়া যায়, যা সর্বজনস্বীকৃত ও প্রমাণিত। আর তা হলো, ইজমায়ে উম্মত (উম্মতের ঐকমত্য ও সর্বসম্মত মত)। যদি কোনো বিষয়ের ওপর সাহাবায়ে কেরাম কিংবা আয়ম্মায়ে কেরাম ও উলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করে তবে তাও শরীয়তের উৎস ও দলিলে পরিণত হয়ে যায়। উলামায়ে কেরাম ইজমার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين فى عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعى فى واقعة

ইজমার সংজ্ঞা : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যুর পরে যেকোনো যুগে যেকোনো বিষয়ের শরঈ হুকুমের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা মুজতাহিদীনে কেরাম রয়েছেন তাঁদের সকলের ঐকমত্য মতামত ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত পেশ করাকে ইজমা বলা হয়। (ইলমু উসূলিল ফিকহ : ৪৫, আল-আহকাম লিল আমেদী : ২৫৪)

আল্লাম আব্দুল ওয়াহাব খাল্লাফ (রহ.) উপরোক্ত সংজ্ঞার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন,

فإذ وقعت حادثة، وعرضت على جميع المجتهدين من الأمة الإسلامية وقت حدوثها، واتفقوا على حكم فيها سمى اتفاقهم إجماعا، واعتبر إجماعهم على حكم واحد، فيها دليلا على أن هذا الحكم، هو الحكم الشرعى فى الواقعة

যখন কোনো ঘটনা সংঘটিত হয় কিংবা কোনো সমস্যা সামনে চলে আসে, অতঃপর তা উম্মতে মুসলিমার সকল মুজতাহিদীনে কেরামের দরবার পেশ করা হয়, আর তাঁরা সকলে সে মাসআলা ও সমস্যার হুকুম ও সমাধানে ইত্তেফাক ও ঐকমত্য পোষণ করেন, তবে তাঁদের এই ইত্তেফাক ও ঐকমত্য পোষণকেই ইজমা বলে। একটি হুকুমের ওপর তাঁদের সকলের ঐকমত্য পোষণকে এ কথার দলিল হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে যে মুত্তাফাকা হুকুম তথা ঐকমত্য পোষণকৃত হুকুমটিই এ বিষয়ের শরঈ হুকুম ও সমাধান। (ইলমু উসূলিল ফিকহ : ৪৫)

ইজমা শরঈ হুজ্জত ও দলিল হওয়ার প্রমাণ : ইজমা ইসলামী শরীয়ত (আইন)-এর তৃতীয় উৎস ও দলিল হওয়ার প্রমাণ কোরআন-হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। কোরআন শরীফের এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (النساء ١١٥)

অনুবাদ : কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পরও সে যদি রাসূলে বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথের অনুসরণ করে, তবে তাকে আমি সেই পথে তুলে দেব, যে পথ সে নিজে অবলম্বন করেছে, আর জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করাব। আর তা অত্যন্ত মন্দ আবাস। (সূরা নিসা : ১১৫)

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

قال العلماء فى قوله تعالى " :ومن يشاقق الرسول "دليل على صحة القول بالإجماع

উলামায়ে কেরাম বলেন, উপরিউক্ত আয়াত শরীফটি ইজমা সহীহ হওয়ার দলিল। (তাফসীরে কুরতুবী; ৫/৩৮৭)

আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) বলেন,

استدل الشافعى، وتابعه الناس بقوله تعالى :ومن يشاقق الخ على حجة الإجماع وتحريم مخالفته

ইমাম শাফেঈ (রহ.) ও তাঁর অনুসরণ করে অন্যান্য উলামায়ে কেরাম ইজমা দলিল ও হুজ্জত হওয়া এবং তার বিরুদ্ধাচরণ হারাম হওয়ার ওপর উল্লিখিত আয়াতকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। (ইস্তিম্বাতুত তানযীল : ৮২)

রাসূলুল্লাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "আমার উম্মত গোমরাহ ও ভ্রষ্ট পথে একমত হতে পারে না।" (তিরমিযী শরীফ : ২/৩৯, আবু দাউদ শরীফ : ২/৫৮৪)

ইজমা শরঈ দলিল ও হুজ্জত এবং ইসলামী বিধি-বিধানের একটি উৎস এ কথার প্রমাণে উপরিউক্ত হাদীস শরীফকেও উলামায়ে কেরাম দলিলস্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্পষ্টভাষায় বলে দিয়েছেন যে আমার উম্মত কখনো ভ্রান্ত পথ, ভ্রষ্টনীতি ও গোমরাহ আকীদা-বিশ্বাসে একমত হতে পারে না। সুতরাং উম্মতের প্রকৃত মুজতাহিদগণ কোনো বিষয়ের ওপর ঐকমত্য পোষণ করলে নিশ্চিত ধরে নিতে হবে তাঁরা হকের ওপর একমত হয়েছেন।

কোরআনে কারীম ও হাদীস শরীফ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে ইজমায়ে উম্মত শরঈ দলিল ও হুজ্জত, যা দ্বারা ইসলামের বিধি-বিধান জানা যায়।

কিয়াস ও ইস্তিম্বাত : অনুরূপ কোরআন-হাদীস দ্বারা আরো একটি ইসলামী শরীয়তের উৎস ও দলিল সাব্যস্ত হয়, যাকে ফুকহায়ে কেরামের ভাষায় কিয়াস বলা হয়। উসূলে ফিকহার ইমামগণ তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

هوإلحاق واقعة لانص على حكمها فى الحكم الذى وردبه النص لتساوى الواقعتين فى علة هذا الحكم

কোরআন-হাদীস-ইজমার স্পষ্ট বাণী

দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ের হুকুমের সাথে প্রমাণিত নয়, এমন বিষয়ের হুকুমকে সংযুক্ত করা উভয়ের ইল্লাত এক হওয়ার কারণে। মানসূস মাসআলার হুকুমকে গাইরে মানসূস মাসআলার জন্য সাব্যস্ত করাকে কিয়াস বলে। (ইলমু উসূলিল ফিকহ : ৫২)

তাকী আমিনী বলেন, "হুকুম এবং ইল্লাতের বিবেচনায় মূলের আদলে শাখার স্বরূপ নির্ণয় হলো কিয়াস।"

এক কথায় বলা যেতে পারে যে বিষয়ে স্পষ্ট হুকুম নেই, সে বিষয়ে হুকুম প্রতিষ্ঠা করা ইল্লাতের বিবেচনায়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো ব্যক্তি যদি জুমু'আর দিন, জুমু'আর আযানের পরে স্কুলে শিশুদের তা'লীম দেয়, তবে তার শরঈ হুকুম কী হবে? এ বিষয়ে কোরআন-হাদীসে স্পষ্টভাষায় কোনো হুকুম ও কোনো নস নেই। কিন্তু ফুকাহায়ে কেরাম অন্য একটি মানসূস বিষয়ের ওপর কিয়াস করে এ কাজটিকেও নাজায়েয বলেন। জুমু'আর আযানের পর ব্যবসা-বাণিজ্য হারাম। তার মূল কারণ ও ইল্লাত হলো, ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে জুমু'আর খুতবা ও নামাযে বিঘ্নতা ও ব্যাঘাত সৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল। সুতরাং জুমু'আর আযানের পরে তেজারত নিষিদ্ধ হওয়ার যে হুকুমটি কোরআনে বর্ণিত হয়েছে সে হুকুমটিকে ফুকাহায়ে কেরাম সেসব বিষয়ের ওপর লাগান, যেখানে উপরিউক্ত ইল্লাত ও কারণ পাওয়া যাবে। সুতরাং তা'লীম-তাআল্লুম ও অন্যান্য যেকোনো কাজ, যদ্দারা জুমু'আর নামাযে ব্যাঘাত ঘটবে তা নাজায়েয ও অবৈধ হবে।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম যে নতুন সমস্যা ও নতুন মাসআলা-মাসায়েলের সম্মুখীন হতেন সেসব বিষয়ে ইজতিহাদ করতেন এবং এক হুকুমকে অন্য হুকুমের ওপর কিয়াস করতেন। এক নজিরকে অন্য নজিরের ওপর কিয়াস করতেন, তথা সাদৃশ্যপূর্ণ ও পরস্পর তুলনাযোগ্য বিষয়াদির মধ্যে একটিকে অপরটির ওপর রেখে বিবেচনা করতেন। (হযরত উমর (রা.) হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা.)-কে বলেছিলেন, "সাদৃশ্যপূর্ণ ও পরস্পর তুলনাযোগ্য বিষয়াদির পরিচিতি লাভ করতে এবং জানতে চেষ্টা-সাধনা করে যাও এবং তোমার সামনে উপস্থিত বিষয়াদি তার ওপর রেখে বিবেচনা করো।)

অতঃপর তিনি বেশ কিছু উদাহরণ লিখে বললেন, ইমাম মুযানী (রহ.) (শাফেয়ী) বলেন, ফুকাহায়ে কেরাম রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত দ্বীন ও শরীয়ত সম্পর্কিত ফিকহী হুকুম-আহকামে ধারাবাহিক কিয়াসের মাধ্যমে সমাধান দিয়ে আসছেন এবং তিনি বলেন, ফুকাহায়ে কেরাম এ কথার ওপর ঐকমত্য ও ইজমা প্রতিষ্ঠা করেছেন যে হকের নজির (সাদৃশ্য) হক হয় এবং বাতিলের নজির বাতিল হয়। সুতরাং কারো জন্য কিয়াসকে অস্বীকার করার কোনো ধরনের অবকাশ নেই। (ইলামুল মু'আককি'য়ীন : ১/২০৩-২০৫)

কিয়াসের প্রামাণ্যতা দলিল : কিয়াস যে দ্বীন ও শরীয়তের অন্যতম উৎস তার হুজ্জিয়ত ও প্রামাণিকতা বহু কোরআনী আয়াত ও হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। এ ক্ষুদ্র পরিসরে কিয়াসের দুটি কোরআনী দলিল ও একটি হাদিসী দলিল উল্লেখ করছি।

প্রথম আয়াত : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁর রাসূলেরও আনুগত্য করো আর তোমাদের যেসব লোক ক্ষমতার অধিকারী তাদেরও আনুগত্য করো। যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং যদি সত্যিকার অর্থে তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রেখে থাকো, তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট সোপর্দ করো। এটাই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি এবং এর পরিণাম সবচেয়ে উত্তম। (সূরা নিসা : ৫৯)

উপরিউক্ত আয়াতে কারীমা দ্বারা বোঝা যায় যে যেসব মাসআলা-মাসায়েল ও সমস্যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক সুস্পষ্ট কোনো হুকুম ও বিধান নেই, সেসব বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূলের বর্ণিত সাদৃশ্যপূর্ণ হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধানে গভীর চিন্তা-ভাবনা, বিচার-বিশ্লেষণ ও গবেষণার মাধ্যমে সেসব নতুন সৃষ্ট বিষয়ে হুকুম বের করতে হবে। আর একেই বলে কিয়াস।

দ্বিতীয় আয়াত :

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

যখন তাদের কাছে শান্তি ও শঙ্কার কোনো সংবাদ আসে তখন তারা

(যাচাই-বাছাই) ছাড়া তার প্রচারে লেগে যায়। অতচ বিষয়টি যদি তারা রাসূল এবং উলিল আমরগণের নিকট পেশ করত তবে ইস্তিম্বাত ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির অধিকারী ব্যক্তিগণ বিষয়টির (আসল রহস্য) উদ্‌ঘাটন করতে পারত। (সূরা নিসা : ৮৩)

আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে ইমাম রাজি (রহ.) বলেন, ১০/১৫৯)

فثبت أن الاستنباط حجة ، والقياس إما استنباط أو داخل فيه ، فوجب أن يكون حجة .إذا ثبت هذا فنقول :الآية دالة على أمور :أحدها :أن فى أحكام الحوادث ما لا يعرف بالنص بل بالاستنباط .وثانيها :أن الاستنباط حجة :وثالثها :أن العامى يجب عليه تقليد العلماء فى أحكام الحوادث . ورابعها :أن النبى صلى الله عليه وسلم كان مكلفا باستنباط الأحكام لأنه تعالى أمر بالرد إلى الرسول وإلى أولى الأمر

সুতরা প্রমাণিত হলো যে ইস্তিম্বাত ও ইজতিহাদ শরীয়তস্বীকৃত একটি হুজ্জত ও দলিল। আর কিয়াসের প্রক্রিয়াটি ইজতিহাদের সমার্থক কিংবা তার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কিয়াসও শরীয়তস্বীকৃত হুজ্জত। আর যদি তা-ই হয় তবে আমি বলব, এ আয়াত দ্বারা চারটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল, প্রথমত : উদ্ভূত সমস্যা ও মাসায়েলের আহকামের ক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নাহর প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট নির্দেশের অবর্তমানে ইজতিহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দ্বিতীয়ত : ইস্তিম্বাত ও কিয়াস শরীয়তে হুজ্জত বা দলিল। তৃতীয়ত : উদ্ভূত সমস্যা ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে আম ও সাধারণ লোকের পক্ষে উলামায়ে কেরামের তাকলিদ করা অপরিহার্য। চতুর্থত : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও উলামা-ফুকাহায়ে কেরামের পক্ষে উদ্ভূত ও নতুন সৃষ্ট আহকামের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ, ইস্তিম্বাত ও কিয়াস করা অপরিহার্য এবং তাঁরা এ বিষয়ে মুকাল্লাফ। (তাফসীরে কাবীর : ১০/১৫৯ মাক. শা.)

হাদীস শরীফ দ্বারা তার প্রমাণ : হযরত মু'আয ইবনে জাবল (রা.)-এর হাদীস তার স্পষ্ট প্রমাণ। যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মু'আয ইবনে জাবল (রা.)-কে ইয়েমেনের কাজি তথা প্রধান বিচারকের পদে নিয়োগ দিলেন তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

كَيْفَ تَقْضِى إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِى بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِى كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِى سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِى وَلَا آلُو قَالَ فَضَرَبَ صَدْرِى فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِى رَسُولَهُ

তুমি যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হও তবে কিভাবে সিদ্ধান্ত নেবে? হযরত মু'আয (রা.) বললেন, আমি কিতাবুল্লাহ দ্বারা সমস্যার সমাধান করব। রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যদি তুমি আল্লাহর কোরআনে কোনো সমাধান খুঁজে না পাও? হযরত মু'আয (রা.) আরজ করলেন, তবে সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বারা ফয়সালা করব। অতঃপর রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সুন্নাতে রাসূলেও যদি সে সমস্যার কোনো সমাধান খুঁজে না পাও তবে কী করবে? হযরত মু'আয (রা.) বললেন তবে আমার রায় ও কিয়াস দ্বারা ইজতিহাদ করব এবং (হকের সন্ধানে) চেষ্টার ত্রুটি করব না। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর প্রিয় সাহবীর বুকে হাত মেরে বললেন, আল-হামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলের কাসেদকে রাসূলের মর্জি ও সন্তুষ্টি মোতাবেক কথা বলার ও মতামত পেশ করার তাওফিক দান করেছেন। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৩৫৯৪)

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রহ.) হাদীসটি বর্ণনা করে তার মান বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "এ হাদীসটি মুত্তাসিল সনদসমৃদ্ধ। তদুপরি বর্ণনাকারীদের সকলেই আদালত ও বিশ্বস্ততায় সুপরিচিত। মুসলিম উম্মাহর সর্বস্তরে সাদরে গৃহীত হওয়ায় হাদীস শরীয়তের দলিল ও প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার ও গ্রহণযোগ্য। (ইলামুল মুকিয়ীন : ১/১৭৫-১৭৬)

মোদ্দাকথা, জুমুহুর উলামায়ে কেরামের নিকট কোরআন-হাদীসের আলোকে মুজতাহিদগণের কিয়াস ও শরয়ী দলিল ও হুজ্জত, যা দ্বারা কোরআন-হাদীসের অস্পষ্ট হুকুম স্পষ্ট করা হয় এবং নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা হয়; তার অর্থ এই নয় যে কিয়াসের মাধ্যমে নতুন সূত্রে হুকুম বানানো হয় এবং সংবিধান রচনা করা হয়। তাই তো উলামায়ে উসূল বলেন,

القياس مظهر لا مثبت

কিয়াস প্রকাশ ও স্পষ্টকারী, প্রণয়ন ও সাবস্তকারী নয়। (উসূলুল বাযদাভী : ১/২২)

ইসলামী শরীয়তের এই দলিল ও উৎস চতুষ্ট তথা কোরআন-হাদীস ও ইজমা-কিয়াস, যা জুমুহুরে উলামায়ে

কেরামের নিকট আমল ও গ্রহণযোগ্য। আইম্মায়ে আরবাআ ইমামে আযম আবু হানীফা (রহ.), ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)সহ অন্য মুজতাহিদ ইমামগণ উপরিউক্ত দলিল চতুষ্টকে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন। শুধুমাত্র আহলে জাহের যাদের মধ্যে বর্তমানের বহু আহলে হাদীস ভাইয়েরাও অন্তর্ভুক্ত আছে তারাসহ কিছু বিপথগামী ফিরকা ছাড়া আর কেউ তা অস্বীকার করেনি।

একটি সংশয় ও ভুলের সংশোধন : কিছু অবুঝ লোক মনে করে, কিয়াস অর্থ আইম্মায়ে কেরাম কর্তৃক শুধুমাত্র স্বীয় বিবেক-বুদ্ধি, বিচার-বিশ্লেষণ ও বুঝ-ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে নিজস্ব খেয়ালখুশি মতে যা ভালো মনে করে তার হুকুম প্রদান করা, অথচ কিয়াসের যে সংজ্ঞায়ন তারা করে থাকে তা সম্পূর্ণরূপে ভুল ও খেয়ালিপনা ছাড়া আর কিছুই না। এসব অবুঝ ও অবিবেচক ব্যক্তিরা যদি "উসূলে ফিকহ"-এর কিতাবসমূহে কিয়াসের যে স্বরূপ ও সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা যদি ভালো করে বুঝে বুঝে পড়ত তবে এসব ভুলভ্রান্তি থেকে পরিত্রাণ পেত এবং কখনো উলামায়ে কেরামের প্রতি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ, তাঁদের সাথে বেয়াদবিমূলক আচরণ ও তাঁদের শানে অশালীন বাক্য উচ্চারণ করত না।

প্রথমে এ কথা অন্তরে বসিয়ে নিতে হবে যে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রকারের ঘটনা ঘটে চলছেই এবং সময়ের গতির সাথে প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়ে চলছেই; যেন সমস্যার কোনো শেষ নেই, এক সমস্যার সমাধান দিতে না দিতেই যেন হাজারো সমস্যা এসে উপস্থিত। উলামায়ে কেরামের সম্মুখে প্রতিমুহূর্তে সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি, আজিব ও গরিব মাসআলা-মাসায়েল একের পর এক আসতেই থাকে। কোরআন-সুন্নাতে এত সব নবোদ্ভূত বিষয়াদির সমাধান স্পষ্ট ভাষায় ও প্রকাশ্য বাক্যে প্রত্যক্ষ কোনো নির্দেশ পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় দুটি পথই খোলা রয়েছে, প্রথমটি হলো, আমরা এ কথা বলে দেব যে উপস্থিত নিত্যনতুন সমস্যা ও নবাবিষ্কৃত মাসআলা-মাসায়েল শরয়ী হুকুম-আহকাম ও আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধানের বহির্ভূত বিষয়, তার কোনো হুকুম নেই। প্রত্যেকে নিজ নিজ খেয়াল-খুশির অনুগামী। এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে উল্লিখিত পথটি সম্পূর্ণরূপে ইসলাম কমেল-মুকাম্মল হওয়ার পরিপন্থী। যে পূর্ণাঙ্গতার কথা কোরআন মজীদে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় পথটি হলো, কোরআন-হাদীসে গভীর চিন্তা-ফিকর ও বিচার-বিশ্লেষণ করে সেসব নিত্যনতুন মাসায়েল ও হালাতসমূহের নজির ও সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের হুকুম জোরাম্বেষণ করা এবং সেসব সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের ওপর উপস্থিত বিষয়াদিকে কিয়াস করা, অতঃপর মানসূসের হুকুম গাইরে মানসূসের জন্য সাব্যস্ত করা। আর ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় এই দ্বিতীয় পথটির নামই হলো কিয়াস। নিঃসন্দেহে এই দ্বিতীয় পথটিই বাস্তবসম্মত ও বিবেকসিদ্ধ এবং সর্বজনস্বীকৃত ও পছন্দনীয়। সাথে সাথে ইসলাম কামেল-মুকাম্মল হওয়ার সাথে বেশ উপযোগী ও মাননসই এবং তার মুওয়াফেক। মোদ্দাকথা, ফুকাহায়ে কেরাম গাইরে মানসূস মাসায়েলের ক্ষেত্রে কিয়াস দ্বারা শরয়ী হুকুম অন্বেষণ করেন এবং কোরআন-সুন্নাহই পাওয়া নজির ও সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়াদি থেকে হুকুম ইস্তিম্বাত করেন। এই বিশেষ মাসআলা ও সমস্যার সমাধানে কোরআন-সুন্নাহ বাহ্যিকভাবে নিশ্চুপ, তবে কোরআন-সুন্নাহই অবিস্থত দ্বিতীয় একটি মাসআলা থেকে সে নতুন মাসআলার হুকুম বের করা হয়, আর তাকেই কিয়াস বলা হয়। হাদীসে নববীতে পরিষ্কার ভাষায় এ কিয়াসের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরামও এ ধরনের মাসায়েলের ক্ষেত্রে কিয়াস দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

কিয়াস কি নিষিদ্ধ? : হয়তো কারো কারো নিকট এ সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে কিছু কিছু সাহাবায়ে কেরাম, উলামায় ও ফুকাহায়ে কেরাম থেকে এমন অনেক বাণী পাওয়া যায়, যা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে দ্বীনি বিষয়ে নিজস্ব রায় ও চিন্তা-ভাবনা দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ হারাম তবে কিয়াস কিভাবে বৈধ হয়। যেমন, হযরত উমর (রা.) বলেন, "দ্বীনি বিষয়ে তোমরা (মনগড়া) রায় থেকে পরহেজ করো। তিনি আরো বলেন, "আসহাবে রায় সুন্নাতের দুশমন।" (ইলামু মুকিয়ীন : ১/৫৫)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেন, ফুকাহায়ে কেরাম চলে যাবেন। তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এবং তাঁদের শূন্যতা পূরণ করতে পারে, এমন লোক খুঁজে পাবে না। এমন লোকের আগমন হবে, যারা স্বীয় মনগড়া রায় দ্বারা খেয়াল-খুশি মতো কিয়াস করবে।" তিনি আরো বলেন, "আমার রায় এইটা, আমার সিদ্ধান্ত এইটা; এমন কথা বলা থেকে বিরত থাকো। কেননা, তোমাদের পূর্বে যে সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছে তারা "আমার রায়, আমার রায়" বলাতে হালাক হয়েছে। (ইলামুল মুকিয়ীন : ১/৫৭)

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) ইলামুল

মুকিয়ীন এবং আল্লামা ইবনু আব্দলি বার (রহ.) জামেউ বায়ানিল ইলমি নামক কিতাবে কিছুসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম ও ফুকাহায়ে কেরাম থেকে দ্বীনি বিষয়াদিতে রায়ের ব্যবহারের খারাবি বর্ণনা করেছেন।

মনে রাখতে হবে, তা থেকে একমাত্র উদ্দেশ্য সেসব মনগড়া রায় ও মতামত, যা কোরআন-সুন্নাহর খেলাফ ও পরিপন্থী। সাদৃশ্যপূর্ণ নজিরের ওপর বিশেষভাবে লক্ষ রেখে গাইরে মানসূস মাসআলা-মাসায়েলের হুকুম ইস্তিম্বাত করার কাজ স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম ও ফুকাহায়ে কেরাম থেকে সাব্যস্ত রয়েছে, ইতিপূর্বে এ বিষয়ের ওপর হযরত ইবনে কাইয়্যিম (রহ.)-এর রেফারেন্সে আলোকপাত করা হয়েছে।

সুতরাং উপরিউক্ত বাণী ও ভাষ্যসমূহ দ্বারা ফুকাহায়ে কেরাম, বিশেষ করে ফিকহে হানাফীর আইম্মায়ে কেরামের ওপর এই মর্মে সমালোচনার তীর নিক্ষেপ করা যে এসব লোক স্বীয় রায় ও কিয়াস এবং অনুমাননির্ভর সিদ্ধান্তকে দ্বীনি বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করেছে; তাদের এই অভিযোগ ও সমালোচনা জাহালাত, মূর্খতা ও চূড়ান্ত পর্যায়ের নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। তারা শুধু আইম্মায়ে কেরামের ওপর মিথ্যারোপ করে ক্ষান্ত হয়নি, এমনকি অনেকেই রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রিয় সাহাবায়ে কেরামের দিকেও আঙুল তুলতে দ্বিধা করেনি।

মোদ্দকথা, গাইরে মানসূস ইজতেহাদী মাসায়েলে কিয়াস দ্বারা সমাধান দেওয়া হয়। আর এ ইজতেহাদী বিষয়াদিতে মুজতাহিদ আইম্মায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য হতে পারে। কেননা, একজন মুজতাহিদ ইমাম উপস্থিত নবাবিষ্কৃত মাসআলার সমাধান দিতে গিয়ে কোরআন-হাদীসে অনুসন্ধানমূলক গবেষণা ও পর্যালোচনাকরত কোন বিষয়টি উদ্ভূত মাসাআলার সাদৃশ্যপূর্ণ ও নজির তা বের করেন। অতঃপর তার হুকুম বয়ান করেন। পক্ষান্তরে অন্য মুজতাহিদ ইমাম কোরআন-হাদীসে গবেষণা করে ভিন্ন এক বিষয়কে উপস্থিত মাসআলার নজির মনে করে তার ভিন্ন হুকুম বর্ণনা করেন। এ বিষয়ে কারো বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অভিযোগ তো করাই যাবে না, উল্টো প্রত্যেকে শরয়ী ইজতিহাদের আলোকে প্রশংসিত ও সওয়াবের অধিকারী হবে।

সর্বাবস্থায় মুজতাহিদ ইমাম প্রশংসাযোগ্য ও পুণ্যের অধিকারী হবেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে হাকেম কিংবা মুজতাহিদ ইজতিহাদ করলেন অতঃপর সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করলেন তিনি দ্বিগুণ সওয়াব পাবেন। পক্ষান্তরে যিনি ভুল সিদ্ধান্ত দিলেন (নেক নিয়্যাতে ইজতিহাদ করা সত্ত্বেও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি) তিনি একটি নেকী পাবেন। (বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ : ২/৭৬; তিরমিযী শরীফ : ১/২৪৭)

এই হাদীস শরীফে হাকিম ও কাজির জন্য সর্বাবস্থায় নেকীর ওয়াদা ও সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। বিশুদ্ধ ও নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলে দ্বিগুণ, পক্ষান্তরে ভুল হয়ে গেলে এক গুণ সওয়াব প্রদান করা হবে। মুজতাহিদ ইমামের হুকুমও একই ও অভিন্ন। আর তাই জুমহুর উলামায়ে কেরাম এই হাদীসটির আলোকে বলেন, মুজতাহিদগণও সর্বাবস্থায় সওয়াব পাবেন।

মোদ্দাকথা, যাদের মধ্যে ইজতিহাদের সক্ষমতা ও যোগ্যতা রয়েছে তারা সর্ব অবস্থায় স্বীয় ইজতিহাদের প্রতিদান ও সওয়াবের যোগ্য বলে বিবেচিত। সুতরাং কাউকে নিন্দা ও সমালোচনা করার প্রশ্নই ওঠে না।

ফিকাহ কী? : উপরিউক্ত দলিল চতুষ্টের আলোকে জাহেরী ইবাদতসমূহ যেমন, নামায, রোযা, হজ, যাকাত ও কোরবানী সাথে সাথে তাহারত ও পবিত্রতা এবং মুআমালা-মুআশারা, লেনদেন, আচার-আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কিত শরয়ী আহকামের সমষ্টি ও মাসায়েল সমগ্রকে ফিকাহ বলা হয়।

আল্লাম আব্দুল ওয়াহহাব আল-খাল্লাফ (রহ.) স্বীয় কিতাব 'ইলমু উসূলিল ফিকহ'তে ফিকাহর তারীফ ও হাকীকত বর্ণনা এবং তার স্বরূপ ও সংজ্ঞায়ন করতে গিয়ে বলেন,

ফিকাহ গঠিত হয় সেসব শরয়ী আহকাম সমগ্র দ্বারা, যার সম্পর্ক সরাসরি মানবজাতির কথা ও কর্মের সাথে আর সেসব আহকাম সমগ্র সরাসরি কোরআন ও হাদীস থেকে অর্জিত কিংবা অন্য দলিলসমূহ থেকে ইস্তিমাবতকৃত। (ইলমু উসূলিল ফিকহ : ১১)

ওপরোল্লিখিত সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল, যে ফিকাহ মূলত কোরআনী ও হাদিসী নুসূস এবং ইজমাঈ ও কিয়াসী উসূলের আলোকে সংকলিত ও প্রণীত আহকাম সমগ্র। ফিকাহ শাস্ত্রে যেমন রয়েছে কোরআন থেকে নির্গত আহকাম, তেমনি রয়েছে হাদীসসমূহ থেকে অর্জিত এবং গবেষণালব্ধ আহকাম। ফিকাহ শাস্ত্র যেমন ইজমাঈ মাসায়েল সমগ্র দ্বারা সমৃদ্ধ, তেমনি সেসব আহকাম ও মাসায়েল দ্বারাও সমৃদ্ধ, যা মুজতাহিদগণ কিয়াসের মাধ্যমে গভীর গবেষণা ও ইজতিহাদ করে বের করেছেন।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

হিজরী নববর্ষ ও আশুরা

কারী জসীমুদ্দীন কাসেমী

হিজরী নববর্ষ ১৪৪০ আমাদের মাঝে সমাগত। আরবী বর্ষপঞ্জি তথা হিজরী সনের প্রথম মাস মুহাররম। আর ১ মুহাররম থেকে হিজরী নববর্ষের সূচনা। মুসলিম উম্মাহর জন্য হিজরী সনের গুরুত্ব অপরিসীম। এর সাথে জড়িত মুসলিম উম্মাহের বিভিন্ন ইবাদত। প্রতিবছর হিজরী নববর্ষ আবির্ভূত হয় প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সেই পবিত্র স্মৃতি নিয়ে।

হিজরত কী এবং কেন? :

হিজরতের অর্থ হলো ত্যাগ করা, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে রাসূল (সা.) ও সাহাবা (রা.)-দের মক্কা নগরী ত্যাগ করে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য মদীনায় চলে যাওয়াকেই হিজরত বলে অবহিত করা হয়।

যুগে যুগে প্রায় সকল নবী-রাসূলকেই নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করে অন্য স্থানে যেতে হয়েছে। কেননা নবী-রাসূলগণের বিরোধিতা করা, তাঁদের অপবাদ দেওয়া, গালমন্দ করা, এমনকি হত্যা পর্যন্ত করা পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন কোনো ঘটনা নয়।

সর্বশেষ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশপ্রাপ্ত হন যে,

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

"অতএব আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন, তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন।" (সূরা : হিজর, ৯৪)

তখন থেকেই প্রিয় নবী (সা.) মক্কার অধিবাসীদের মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য আহ্বান করতে লাগলেন। হাতে গোনা কয়েকজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছাড়া মক্কার অধিকাংশ কাফের-মুশরিকরাই রাসূল (সা.)-এর সেই আহ্বানে সাড়া দিল না। সাড়া তো দিলই না, বরং তাঁর প্রচারকাজে নানাভাবে বাধার সৃষ্টি করতে লাগল। চালাতে থাকল অমানুষিক জুলুম-নির্যাতন, এমনকি সামাজিকভাবেও রাসূল (সা.) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বয়কট করে। কেউ কেউ আবার প্রাচুর্যের প্রলোভনও দেখাল। তাদের সেই শত নির্যাতন ও প্রলোভনকে পদদলিত করে রাসূল (সা.) দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে ঘোষণা করলেন, 'আমার এক হাতে চাঁদ আরেক হাতে যদি সূর্যও এনে দেওয়া হয় তবুও আল্লাহ আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা পালন করা থেকে কোনো অবস্থাতেই আমি বিরত হব না।'

রাসূল (সা.)-এর এই ঘোষণা শুনে কাফের-মুশরিকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে তারা মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করে ফেলবে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাকে সে কথা জানিয়ে দিয়ে হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ তা'আলার সেই নির্দেশে তিনি স্বীয় বিছানায় হযরত আলী (সা.)-কে রেখে অতি সন্তর্পণে গৃহ ত্যাগ করেন এবং তাঁর প্রিয় সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দিক (সা.)-কে সঙ্গী করে মক্কা থেকে ২৯৬ মাইল দূরে অবস্থিত মদীনার অভিমুখে রওনা হন। যেখানে রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে তাঁর আগেই অনেক সাহাবী একে একে পাড়ি জমিয়ে ছিলেন।

মদীনার লোকেরা যখন জানতে পারল হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদীনায় আসছেন, তখন সেখানকার লোকজন তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য তৈরি হলেন। তিনি দীর্ঘ ২৯৬ মাইল পথ পেরিয়ে ১৫ দিন পর মদীনার উপকণ্ঠ কুবা নামক মহল্লায় এসে পৌঁছলে আনসারগণ তাঁকে স্বাগত জানালেন। অনেকের কণ্ঠে উচ্চারিত হলো,

أشرق البَدْر علينا ...من ثنيات الْوَدَاع
وَجب الشُّكر علينا ...مَا دَعَا لله دَاع

(موارد الظمأن الى زوائد ابن حبان ١/٤٩٤ رقم ٢٠١٥)

এই হিজরত ইসলাম প্রচার ও প্রসারে যে অনন্য ভূমিকা রেখেছে তার কোনো তুলনাই হয় না। ইসলামের সুদূরপ্রসারী দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল এই হিজরতের মাধ্যমে।

হিজরী সনের সূচনা :

একসময় আরবদের মধ্যে কোনো নির্ধারিত বর্ষ গণনা পদ্ধতি ছিল না। বিভিন্ন ঘটনার ওপর নির্ভর করে তারিখ বলা হতো। যেমন–অমুক ঘটনার অত বছর পরে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে ও তার পূর্বে রোমান, পার্শিয়ান ও অন্যান্য জাতির মধ্যে তাদের নিজস্ব ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকা প্রচলিত ছিল। খলিফা হযরত উমর (রা)-এর খেলাফতের তৃতীয় বা চতুর্থ বছর আবু মুসা আশআরী (রা.) তাঁকে পত্র লিখে জানান যে আপনার সরকারি ফরমানগুলোতে সন-তারিখ না থাকায় প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দেয়; এ জন্য একটি বর্ষপঞ্জি ব্যবহার প্রয়োজন। খলিফা উমর (রা.) সাহাবীগণকে একত্রিত করে পরামর্শ করেন। কেউ কেউ রোম বা পারস্যের পঞ্জিকা ব্যবহার করতে পরামর্শ দেন। কিন্তু অন্যরা তা অপছন্দ করেন এবং মুসলিমদের জন্য নিজস্ব পঞ্জিকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এ বিষয়ে কেউ কেউ পরামর্শ দেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মীলাদ বা জন্ম থেকে সাল গণনা শুরু করা হোক। কেউ কেউ তাঁর নবুওয়াত থেকে, কেউ কেউ তাঁর হিজরত থেকে এবং কেউ কেউ তাঁর ওফাত থেকে বর্ষ গণনার পরামর্শ দেন। হযরত আলী (রা.) হিজরত থেকে সাল গণনার পক্ষে জোরালো পরামর্শ দেন। খলিফা উমর (রা.) এ মত সমর্থন করে বলেন যে হিজরতই হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যের সূচনা করে; এ জন্য আমাদের হিজরত থেকেই সাল গণনা শুরু করা উচিত। অবশেষে সাহাবীগণ হিজরত থেকে সাল গণনার বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

কোন মাস থেকে বর্ষ গণনা শুরু করতে হবে সে বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হলে কেউ কেউ রবিউল আউয়াল মাসকে বছরের প্রথম মাস হিসেবে গ্রহণ করার পরামর্শ দেন; কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) এ মাসেই হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন। ১২ রবিউল আউয়াল তিনি মদীনায় পৌঁছান। কেউ কেউ রমাযান থেকে বর্ষ গণনা শুরুর পরামর্শ দেন; কারণ রমাযান মাসে আল্লাহ তা'আলা কোরআন নাযিল করেন। সর্বশেষ তাঁরা মুহাররম মাস থেকে বর্ষ শুরুর বিষয়ে একমত হন; কারণ এ মাসটি ৪টি 'হারাম' বা সম্মানিত মাসের একটি। এ ছাড়া ইসলামের সর্বশেষ রুকন হজ পালন করে মুসলিমগণ এ মাসেই দেশে ফেরেন। হজ পালনকে বছরের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর্ম ধরে মুহাররম মাসকে নতুন বছরের শুরু বলে গণ্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের প্রায় ৬ বছর পরে ১৬ বা ১৭ হিজরী সাল থেকে সাহাবীগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হিজরী সাল গণনা শুরু হয়। যদিও হিজরত রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়, তবুও দুই মাস এগিয়ে সে বছরের মুহাররম থেকে বর্ষ গণনা আরম্ভ হয়। (আত-তারিখ [তাবারী] ২/৩-৪; আল-মনতাযিম [ইবনুল জওজী] ২/১।

হিজরী সনের প্রভাব ও গুরুত্ব :

হিজরী সনের প্রভাব মুসলমানদের জীবনে ব্যাপক। জীবনের সব ক্ষেত্রেই এর প্রভাব ও গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষত ইবাদতের তারিখ, ক্ষণ ও মৌসুম নির্ধারণের ক্ষেত্রে হিজরী সনের প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন–রমাযানের রোযা, দুই ঈদ, হজ, যাকাত ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলোতে হিজরী সন ধরেই আমল করতে হয়। রোযা রাখতে হয় চাঁদ দেখে, ঈদ করতে হয় চাঁদ দেখে। এভাবে অন্যান্য আমলও। এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পর মহিলাদের ইদ্দতের ক্ষেত্রগুলোতেও হিজরী বর্ষের হিসাব গণনা করতে হয়। অর্থাৎ মুসলমানদের ধর্মীয় কতগুলো দিন-তারিখের হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্র রয়েছে, সেগুলোতে হিজরী সনের হিসাবে দিন, তারিখ, মাস ও বছর হিসাব করা আবশ্যকীয়। এ কারণে হিজরী সনের হিসাব স্মরণ রাখা মুসলমানদের জন্য জরুরি।

মাহে মুহাররমের ফজীলত :

মুহাররম মাস "হারাম" মাসগুলোর অন্যতম। ইসলামী শরীয়তে জিলকদ, জিলহজ, মুহাররম ও রজব–এই ৪টি মাসকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। এগুলো 'হারাম' অর্থাৎ 'নিষিদ্ধ' বা 'সম্মানিত' মাস বলে পরিচিত। এ সকল মাসে সকল প্রকার পাপ ও অন্যায় থেকে বিরত থাকতে ও অধিক নেক আমল করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে কোরআন ও হাদীসে। এই ৪ মাসের মধ্যে মুহাররম মাসকে বিশেষভাবে মর্যাদা প্রদান করে একে 'আল্লাহর মাস' বলে আখ্যায়িত করেছেন রাসূলুল্লাহ (সা.)।

যেমন রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন–

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ :سَأَلْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ عَنْ صَوْمٍ، عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: "إِنَّ الْمُحَرَّمَ شَهْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنَّ فِيهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، أَذْنَبَ فِيهِ قَوْمٌ ذَنْبًا عَظِيمًا، فَتَابُوا فِيهِ فَكَانَ يُسَمَّى يَوْمَ التَّوْبَةِ قَالَ :فَلَا يَمُرَّنَّ عَلَيْكَ إِلَّا صُمْتُهُ

হাদীস শরীফ থেকে এ কথাও জানা

যায় যে মুহাররম মাসের নফল রোযার সওয়াব অন্য সকল নফল রোযার সওয়াবের চেয়ে বেশি। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ

"রমাযানের পরে সবচেয়ে বেশি ফজীলতের রোযা হলো আল্লাহর মাস মুহাররমের রোযা।" (মুসলিম শরীফ ২/৮৬১ হা. [১১৬৩] ২০২)

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِى أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ لَهُ :مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَسْأَلُ عَنْ هَذَا، إِلَّا رَجُلًا سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِى أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ :إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُمُ الْمُحَرَّمَ، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ، فِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ، وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ

হযরত আলী (রা.)-এর কাছে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, রমাযান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে আমি রোযা রাখব? হযরত আলী (রা.) বলেন, এরূপ প্রশ্ন একদা রাসূল (সা.) থেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তখন আমি তাঁর পাশে বসা ছিলাম। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, রমাযান মাস ব্যতীত যদি তুমি রোযা রাখতে চাও তবে মুহাররম মাসে রোযা রাখো। কারণ এটি আল্লাহ তা'আলার (খাস রহমতের) মাস। তাতে এমন একটি দিন আছে, যাতে আল্লাহ এক সম্প্রদায়ের তাওবা কবুল করেছেন এবং আগামীতেও এক সম্প্রদায়ের তাওবা ওই দিন কবুল করা হবে। (তিরমিযী শরীফ ১/১৫৭ হা. ৭৪১)

আশুরার ঐতিহাসিক গুরুত্ব :

বহু হাদীস ও ইতিহাস থেকে আশুরার দিনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। আশুরার দিন মুসলমানদের জন্য অনেক কিছুর স্মৃতিবিজড়িত দিন। বিভিন্ন গ্রন্থে এই দিনসংক্রান্ত বহু ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে কতিপয় নিম্নরূপ :

১। এই দিনে আল্লাহ তা'আলা আসমান, জমিন, কলম এবং হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন।

২। এই দিন হযরত আদম (আ.)-এর তাওবা কবুল করা হয়।

৩। এই দিন হযরত ইদ্রিস (আ.)-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়।

৪। এই হযরত নূহ (আ.)-এর কিস্তি ভয়াবহ বন্যা থেকে নিরাপদ করে জুদি পাহাড়ে নোঙর করা হয়।

৫। এই দিন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য অগ্নিকুণ্ডলীকে ফুলের বাগিচায় পরিণত করা হয় এবং তাকে আল্লাহ তা'আলার খলিল বলে খেতাব দান করা হয়।

৬। এই দিন হযরত ইসমাঈল (আ.) জন্মগ্রহণ করেন।

৭। হযরত ইউসুফ (আ.) জেল থেকে মুক্ত হন এই দিনে।

৮। এই দিন দীর্ঘকাল পর হযরত ইউসুফ (আ.)-এর হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়।

৯। এই দিন হযরত মুসা (আ.) এবং তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরায়েল ফেরাউনের জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্তি অর্জন করে।

১০। এই দিন হযরত মুসা (আ.)-এর ওপর তাওরাত অবতীর্ণ হয়।

১১। এই দিন হযরত সুলাইমান (আ.)-এর শাহী ক্ষমতা ফিরে পান।

১২। এই দিন হযরত ইউনুস (আ.) চল্লিশ দিন মাছের পেটে থাকার পর মুক্তি পান।

১৩। এই দিন দিন হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের তাওবা কবুল হয়।

১৪। হযরত ঈসা (আ.) জন্মলাভ করেন এই দিনে এবং এই দিন হযরত ঈসা (আ.)-কে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচিয়ে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়।

১৫। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)-এর বিবাহ হয় এই দিনে।

১৬। এই দিন কুফার দুষ্কৃতকারীরা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর দৌহিত্র হযরত হুসাইন (রা.)-কে কারবালায় শহীদ করে।

(নুযহাতুল মাজালিস ১/৩৪৭, মাআরিফুল কোরআন, মাআরিফুল হাদীস ৪/১৬৮)

হাদীস শরীফেও আশুরার ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সে কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) এই দিনের মহত্বতা সম্পর্কে মুসলমানদের অবহিত করেন। এই দিনে রোযা রাখার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (আ.) হতে

বর্ণিত। তিনি বলেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ :مَا هَذَا؟، قَالُوا :هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ :فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় আগমন করে দেখতে পেলেন ইহুদিরা আশুরার দিন রোযা পালন করছে। নবীজি (সা.) বললেন, এটি কী? তারা বলল, এটি একটি ভালো দিন। এই দিনে আল্লাহ তা'আলা বনি ইসরায়েলকে তাদের দুশমনের কবল থেকে বাঁচিয়েছেন। তাই মুসা (আ.) রোযা পালন করেছেন। রাসূলুল্লাহ বললেন, মুসাকে অনুসরণের ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে অধিক হকদার। অতঃপর তিনি রোযা রেখেছেন এবং রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। (বোখারী শরীফ : ২০০৪)

বোখারী শরীফের বর্ণনায় আছে–

هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ এটি একটি ভালো দিন।

মুসলিমের বর্ণনায় আছে–

هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرّق فرعون وقومه

এটি একটি মহান দিন, আল্লাহ তা'আলা তাতে মুসা (আ.) ও তাঁর কওমকে রক্ষা করেছেন আর ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছেন।

বোখারী শরীফের বর্ণনায় আছে–

فصامه موسى মুসা (আ.) রোযা পালন করেছেন।

মুসলিম শরীফে বর্ণনায় আছে–

شكراً لله تعالى فنحن نصومه আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায়স্বরূপ তাই আমরাও রোযা পালন করি।

বোখারীর অন্য বর্ণনায় আছে,

ونحن نصومه تعظيماً له আর আমরা রোযা পালন করি তার সম্মানার্থে।

মুসনাদে আহমাদে সামান্য বর্ধিতাকারে আছে–

وهو اليوم الذى استوت فيه السفينة على الجودى فصامه نوح شكراً

এটি সেই দিন, যাতে নূহ (আ.)-এর কিস্তি জুদি পর্বতে স্থির হয়েছিল, তাই নূহ (আ.) আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ার্থে সেদিন রোযা রেখেছিলেন।

আশুরার রোযা :

জাহেলী যুগে কোরাইশদের মধ্যে আশুরার দিন বড়ই মহৎ ও সম্মানী ছিল। এই দিন কাবাঘরে গিলাফ পরানো হতো। কোরাইশরা ওই দিন রোযা রাখত। রাসূল (সা.)-এর নীতি ছিল কোরাইশরা মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসরণে যেসব উত্তম কাজ করত রাসূল (সা.) এতে শরীক থাকতেন। সেই হিসেবে হজেও শরীক থাকতেন। এই নীতি অনুসারে রাসূলুল্লাহ (সা.) আশুরার রোযাও রাখতেন। এই দিনের রোযার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতেন। মুসলমানদেরও এই ব্যাপারে গুরুত্ব সহকারে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বোখারী ও মুসলিম শরীফে সালামা ইবনে আকওয়া এবং রাবী বিনতে মুআওয়াজ ইবনে আফরার সূত্রে বর্ণিত রাসূল (সা.) আশুরার দিন মদীনা এবং আশপাশের বস্তিসমূহ যেখানে আনসাররা ছিলেন এই খবর পাঠালেন যে যারা এখনো কোনো প্রকার খানাপিনা করেনি তারা যেন রোযা রাখে। যারা খানাপিনা করেছে তারাও যেন বাকি দিন কিছু না খায়। বরং রোযাদারদের মতো থাকে। পরে যখন রমাযানের রোযা ফরয হলো তখন আশুরার রোযার আবশ্যিকতা রহিত হয়ে যায়। তা নফল রোযা হিসেবে পরিগণিত হয়। (বোখারী শরীফ ১/২৬৮, মুসলিম শরীফ ১/৩৬০)

হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর বর্ণনায় আছে–

عَنْ نَافِعٍ، قَالَ :أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ": إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ تَعَالَى، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ

হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, জাহেলী যুগের লোকেরা আশুরার দিন রোযা রাখত। রাসূল (সা.) ও মুসলমানগণও আশুরার রোযা রাখতেন। যখন রমাযানের রোযা ফরয হলো তখন রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আশুরার দিন আল্লাহ তা'আলার দিনসমূহের একটি, যার ইচ্ছা এই দিন রোযা রাখো যার ইচ্ছা না রাখো। (মুসনাদে আহমদ হা. ৬২৯২)

পরে রাসূল (সা.) ফরয রোযা ব্যতীত নফল রোযার মধ্যে আশুরার রোযার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতেন। (মাআরিফুল হাদীস ৪/১৬৮)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

ما رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

يَتَحَرّىٰ صيامَ يومٍ فضَّلَه على غيرِه الّا هـذا اليـومَ يـومَ عـاشوراءَ وهذا الشهرَ يعنى شهرَ رَمَضَان

আমি নবী করীম (সা.)-কে এই দিনের চেয়ে অন্য কোনো দিনকে এত বেশি গুরুত্ব দিতে দেখিনি, অর্থাৎ আশুরার দিন এবং মাসের মধ্যে রমাযান মাস। বোখারী শরীফ ১/২৬৮, মুসলিম শরীফ ১/৩৬০)

আরেক হাদীসে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণিত–

لَيْسَ لِيَوْمٍ فَضْلٌ عَلٰى يومٍ فِى الصِّيَامِ الَّا شَهْرَ رَمَضَانَ وَيَوْمَ عَاشُوْرَاءَ

রোযা রাখার ব্যাপারে এক দিন থেকে অন্য দিনে ফজীলত নেই; কিন্তু মাহে রমাযান এবং আশুরার দিন। (অর্থাৎ এগুলোতে অন্য দিন ও মাসের তুলনায় ফজীলত বেশি) (আততারগীব ওয়াত তারহীব ২/১১৫)

عـن أبـى قتادة رضى اللّٰه عنه قال قال رسـولُ الـلّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم :انّى أحْتَسِـبُ عَلَى اللّٰهِ أنْ يُكفّر السنةَ التى قَبْلَه

হযরত আবু কাতাদা সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমার আশা আশুরার দিনের রোযা বিগত বছরের গোনাহের কাফফারা হবে। (মুসলিম শরীফ ১/৩৬৭, ইবনে মাজা পৃ. ১২৫)

এসব হাদীস থেকে আশুরার দিনের ফজীলত, গুরুত্ব ও তাৎপর্য প্রতীয়মান হয়। সুতরাং আমাদের উচিত এই দিনের বরকত অর্জনে রাসূল (সা.)-এর নির্দেশিত পন্থায় এই দিনের আমলের মধ্যে জুড়ে থাকা।

আশুরার দিনে করণীয় আমল :

হাদীস শরীফে আশুরার দিনের দুটি আমল পাওয়া যায়।

প্রথম আমল : রোযা রাখা। এই ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, হাদীস শরীফে কাফের-মুশরিকদের অনুসরণ ও অনুকরণে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অন্যদিকে এই দিনের রোযা ছেড়ে দেওয়ার কারণে এর বরকত থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তাই রাসূল (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন যে আশুরার দিনের সাথে আরেক দিন রোযা রাখো। উত্তম হলো নবম এবং দশম দিন রোযা রাখা। যদি কেউ নবম দিন রোযা রাখতে না পারে তবে দশম এবং এগারোতম দিন রোযা রাখা। যাতে ইহুদিদের সাদৃশ্যতা পাওয়া না যায়। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে–

يَـقُولُ :سَـمِـعْـتُ عَبْـدَ الـلـهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِـىَ الـلـهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ :حِينَ صَامَ رَسُـولُ الـلـهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَـاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا :يَا رَسُولَ الـلـهِ إِنَّـهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَـإِذَا كَـانَ الْـعَـامُ الْـمُـقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ :فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْـمُـقْبِـلُ، حَتَّى تُوُفِّىَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আশুরার রোযা রাখলেন এবং (অন্যদের) রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এটি তো এমন দিন, যাকে ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বড় জ্ঞান করে, সম্মান জানায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আগামী বছর এদিন এলে আমরা নবম দিনও রোযা রাখব ইনশাআল্লাহ। বর্ণনাকারী বলছেন, আগামী বছর আসার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওফাত হয়ে গিয়েছেন। (মুসলিম শরীফ হা. [১১৩৪]১৩৩)

এক হাদীসে আছে যে,

صـومـوا عـاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما

'তোমরা আশুরার রোযা রাখো এবং ইহুদিদের সাদৃশ্য পরিত্যাগ করে; আশুরার আগে বা পরে আরো এক দিন রোযা রাখো।' (মুসনাদে আহমদ ১/২৪১)

কিছু কিছু ফুকাহায়ে কেরাম শুধু আশুরার দিন রোযা রাখাকে মাকরূহ বলেছেন। কিন্তু আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) লেখেন, আশুরার রোযা তিন প্রকারে রাখা যায়। ১। নবম, দশম এবং এগারোতম দিন মোট তিনটি রোযা রাখা। ২। নবম দশম বা দশম ও এগারোতম রোযা রাখা। ৩। শুধু দশ তারিখের রোযা রাখা। এসবের মধ্যে প্রথম প্রকার সর্বোত্তম। দ্বিতীয় প্রকার উত্তম। তৃতীয় প্রকারটা অনুত্তম। হয়তো ফকীহগণ এই অনুত্তমকেই মাকরূহ বলেছেন। অথচ রাসূল (সা.) দশম তারিখের রোযা রেখেছেন এবং নবম তারিখে রোযা রাখার শুধু আশা প্রকাশ করেছিলেন, যা ইন্তেকাল হওয়ার কারণে রাখতে পারেননি। সুতরাং এটিকে মাকরূহ বলা যাবে না।

দ্বিতীয় আমল : পরিবার-পরিজনের মধ্যে খানাপিনা প্রশস্তকরণ।

(বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : দাফন

লুৎফুর রহমান
বিজয়নগর, বি-বাড়িয়া।

জিজ্ঞাসা :

(ক) বর্তমান সমাজে দেখা যায় যে কিছু লোক কবরে মাটি দেওয়ার সময় কোরআনের একটি আয়াত, অর্থাৎ منها خلقناكم الخ দু'আ হিসেবে পড়ে থাকে, এখন আমার জানার বিষয় হলো যে, কবরে মাটি দেওয়ার সময় কোরআনের এই আয়াতকে দু'আ হিসেবে পড়া শরীয়তসম্মত কি না?

(খ) কবরে মাটি দেওয়ার সময় অনেকে প্রথমে মাটিকে তিন ভাগ করে, এক মুষ্টি মাটি মাথার দিকে আরেক মুষ্টি মাটি মধ্যখানে আরেক মুষ্টি মাটি পায়ের দিকে রাখে। জানার বিষয় হলো যে এই পদ্ধতিতে মাটি দেওয়া শরীয়তসম্মত কি না?

সমাধান :

মৃত ব্যক্তিকে মাটি দেওয়ার সময় কোরআনে কারীমের উল্লেখিত আয়াত পড়ার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

মাটি দেওয়ার মুস্তাহাব পদ্ধতি হলো মৃত ব্যক্তির মাথার দিকে দাঁড়িয়ে উভয় হাত দ্বারা তিনবার মাটি দেওয়া। প্রথমবার দেওয়ার সময় منها خلقناكم দ্বিতীয়বার দেওয়ার সময় وفيها نعيدكم এবং তৃতীয় বার দেওয়ার সময় ومنها نخرجكم تارة اخرى পড়া। অতএব প্রশ্নে উল্লেখিত মাটি দেওয়ার প্রথাটি বর্জনীয়। (ইবনে মাজাহ-২৭৭, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/১৬৬, কেফায়াতুল মুফতী-৫/৪৮৯)

প্রসঙ্গ : মাতা-পিতার হক

মুফতী আহমদ হোসাইন
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসা :

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কোনো সৎ সন্তান মা-বাবার প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে একবার তাকালে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে একটি মকবুল হজের সওয়াব দান করেন। এখন আমার জানার বিষয় হলো, যদি কোনো সন্তান প্রবাস থেকে ভিডিও কলের মাধ্যমে মা-বাবার সাথে কথা বলে এবং ভিডিও কলের দ্বারা মা-বাবার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেয় তাহলেও কি সে উক্ত সওয়াব পাবে?

সমাধান :

ভিডিও কলের দ্বারা মা-বাবার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিলে উল্লেখিত হাদীস শরীফের সওয়াব পাবে না বরং অনুপস্থিত সন্তান বাবা-মার জন্য "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا" বা এজাতীয় মাছুর দু'আ পড়ে তাদের প্রতি মুহাব্বত প্রকাশ করলে সওয়াব পাবে। (আল বাহরুর রায়েক-৩/১৭৮, রদ্দুল মুহতার-৩/৩৪)

প্রসঙ্গ : কোরবানী

আব্দুর রাজ্জাক
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

জিজ্ঞাসা :

জনৈক ব্যক্তির ওপর কোরবানী ওয়াজিব, তিনি যথারীতি কোরবানীর পশু ক্রয় করেন, কিন্তু কোরবানীর দিন জন্তু জবেহ করার সময় নফল কোরবানীর নিয়্যাতে যন্তু জবেহ করে ফেলেন, এখন জানার বিষয় হলো যে–

১. নফলের নিয়্যাতে জন্তু জবেহ করার দ্বারা উনার ওয়াজিব কোরবানী আদায় হবে কি না?

২. যদি না হয়ে থাকে তাহলে এখন উনার করণীয় কী?

সমাধান :

নফলের নিয়্যাতে জন্তু জবেহ করলে নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী ওয়াজিব কোরবানী আদায় হয়ে যাবে, তবে সতর্কতা হলো, কোরবানীর দিন বাকি থাকলে পুনরায় আদায় করা। (রদ্দুল মুহতার-৬/৩৩৫, কেফায়াতুল মুফতী-৮/২০৫, কিতাবুন নাওয়াযিল-১৪/৫১৪)

প্রসঙ্গ : মাদরাসা

আব্দুল আজিজ
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসা :

যাকাতের টাকা বা অন্য কোনো আমানতের টাকা মাদরাসার মুহতামিমের কাছে জমা আছে। এমতাবস্থায় মুহতামিমের জন্য তাঁর কোনো জরুরি বিষয়ে উক্ত জমাকৃত টাকা থেকে করযের নিয়্যাতে নেওয়া বৈধ হবে কি না?

সমাধান :

মাদরসার মুহতামিমের জন্য যাকাতের টাকা বা অন্য কোনো আমানতের টাকা নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করা বৈধ নয়, যদিও তা করযের ভিত্তিতে হয়। (সূরা নিসা-৫৮, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১/৫২৬, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম-৬/২০৮)

প্রসঙ্গ : নামায

মুহাম্মদ ছাদেকুর রহমান
জামতলা জামে মসজিদ।

জিজ্ঞাসা :

জামতলা জামে মসজিদের ভেতরের অংশে ৫ কাতার ও বারান্দায় ২

কাতারসহ মোট ৭ কাতারে নামায পড়ার ব্যবস্থা আছে; কিন্তু পঞ্চম কাতারের জায়গা ছোট হওয়ার কারণে নামায বোঝে, এমন ছোট বাচ্চাদের কাতার করে নামায আদায় করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি না, তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা রইল।

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে নামাযে কাতারের মোস্তাহাব পদ্ধতি হলো প্রথমে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ দাঁড়াবে অতঃপর অপ্রাপ্ত বয়স্ক নামায বোঝে, এমন বাচ্চারা দাঁড়াবে। তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাদের কাতারের পর প্রাপ্তবয়স্ক মুসল্লি দাঁড়ালে তাদের নামাযে কোনো ক্ষতি হবে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পঞ্চম কাতারে প্রয়োজনে ছোট বাচ্চাদের দাঁড়ানোর অনুমতি আছে। (রদ্দুল মুহতার-১/৫৬৮, আল বাহরুর রায়েক-১/৩৫৩, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম-৩/৩৭১)

প্রসঙ্গ : হজ

মুহা. আব্দুর রহমান
দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

এমন লোক, যার নিকট সামান্য কিছু জমি ছাড়া নগদ কোনো টাকা নেই। এমতাবস্থায় পরিবারের জন্য কিছু না রেখে ওই জমি বিক্রি করে তার হজে যাওয়া জায়েয কি না? এবং যাওয়ার সময় রাস্তায় কোনো দুর্ঘটনার কারণে হজ না করতে পারে তাহলে তার ওপর দ্বিতীয়বার হজ করা ফরয হবে কি না?

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির ওপর হজ ফরয নয়, তথাপি যদি সে প্রয়োজনীয় জমি বিক্রি করে হজ করতে চায় তাহলে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। তবে হজের দিনগুলোতে পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করে যাওয়া জরুরি। উক্ত ব্যক্তি হজের ইহরাম বাঁধার পর কোনো দুর্ঘটনার কারণে যদি হজে যেতে না পারে তাহলে হেরেম শরীফে একটি বকরি জবাইয়ের ব্যবস্থা করবে। উক্ত বকরি জবাই হওয়ার পর ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে একটি হজ ও একটি ওমরাহ আদায় করা ফরয। (সূরা আলে ইমরান-৯৭, তিরমিযী শরীফ-১/১৬৮, বোখারী শরীফ-১৯১)

প্রসঙ্গ : ইসলামী ব্যাংক

হাজী আবুল কালাম আলমগীর
মধুবাগ, মগবাজার।

জিজ্ঞাসা :

আমি একজন ব্যবসায়ী, কিন্তু ব্যবসা পরিচালনার জন্য আমার সংসারে অনেক লোক, তাদের ভরণপোষণের জন্য আমার এ ব্যবসা। ইসলামী ব্যাংক/আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ হইতে বিনিয়োগ নিয়ে ব্যবসা করতে পারব কি না? তা শরীয়তসম্মত উত্তরদানে আপনার সুমর্জি কামনা করছি।

সে মতে মুহতারাম, ইসলামী ব্যাংক/আল-আরাফাহ্ ইসলাঈ ব্যাংক লিঃ হইতে বিনিয়োগ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করার শরীয়তসম্মত অনুমতি আছে কি না? সে বিষয়ে আপনার মতামত প্রদান করতে আপনার সুমর্জি কামনা করছি।

সমাধান :

আমাদের দেশের প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলোর অধিকাংশ শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত হওয়ার দাবি করে আসছে এবং তার তদারকির জন্য উলামায়ে কেরামের পরামর্শও নিয়ে থাকে। তাই তাদের দাবি বাস্তবসম্মত হলে এবং তাদের দাবির বরখেলাফ কিছু প্রমাণিত না হলে তাদের সহযোগিতা নিয়ে হালাল পন্থায় ব্যবসা করার অবকাশ আছে। তবে কোনো অবস্থাতেই সুদের ওপর লোন নেওয়া যাবে না। সন্দেহ হলে তাদের সাথে লেনদেন করা থেকে বিরত থাকা সতর্কতার দাবি। ব্যক্তিগত মূলধন দিয়ে ছোট পরিসরে ব্যবসা করাই নিরাপদ। (সূরা বাকারা-২৭৫, মুসলিম শরীফ-১৯৭, ফাতহুল কদির-১৪৭)

প্রসঙ্গ : তারাবীহ

হাফেজ জুনায়েদ আহমেদ
চরফ্যাশন, ভোলা।

জিজ্ঞাসা :

হাফেজ ইব্রাহীম এজন মাদরাসার ছাত্র, তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, মাদরাসার প্রয়োজনীয় খরচ এবং নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই, তিনি তাঁর হেফজ স্মরণ রাখার জন্য রমাযান মাসে খতমে তারাবীর ইমামতি করেন এবং কোনো ধরনের বিনিময় গ্রহণের শর্ত ব্যতীত মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে দেওয়া হাদিয়া গ্রহণ করে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করেন। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে যে তাঁর জন্য উক্ত হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ হবে কি না?

সমাধান :

পবিত্র রমাযান মাসে তারাবীর নামাযে খতমে কোরআনের পারিশ্রমিক আদান-প্রদান শরীয়তের আলোকে নাজায়েয। দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই গোনাহগার হবে। উক্ত বিনিময় যে নামেই দেওয়া হোক তা বিনিময় হিসেবে ধর্তব্য হবে। এ টাকা হাদিয়া নাম দেওয়া হাদিয়া শব্দের অপব্যবহার। তাই প্রশ্নে বর্ণিত হাফেজ সাহেবকে খতম তারাবীর পর কমিটির পক্ষ থেকে হাদিয়ার নামে টাকা-পয়সা যা দেওয়া হচ্ছে তা মূলত কোরআন খতমের বিনিময় হিসেবে ধর্তব্য হয়ে নাজায়েয বলে বিবেচিত হবে। তবে হাফেজ সাহেব গরিব হলে রমাযান ছাড়া অন্য

সময় হাদিয়া বা যাকাত দ্বারা সহযোগিতা করা যেতে পারে। (রদ্দুল মুহতার-৬/৫৬, আল বাহরুর রায়েক-৮/৩৪, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম-২/২৪৬)

প্রসঙ্গ : বিকাশ

মাও. এনামুল হক
মিরপুর, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

ওমর নামের এক ব্যক্তি খালেদ থেকে ১০০০ টাকা ঋণ নেয়। অতঃপর ওমর বিকাশের মাধ্যমে খালেদের বিকাশ অ্যাকাউন্টে ১০২০ টাকা পাঠায়। এখন খালেদ ইচ্ছা করলে বিকাশ এজেন্ট থেকে খরচ বাদে ১০০০ টাকা আনতে পারে অথবা সে নিজে অন্যের মোবাইলে রিচার্জ করে ১০২০ টাকার মালিক হয়ে যাবে। এ সুরতে খালেদ অতিরিক্ত ২০ টাকা পাবে। প্রশ্ন হলো এ অতিরিক্ত ২০ টাকা নেওয়া তার জন্য জায়েয হবে কি?

সমাধান :

প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে খালেদের জন্য অন্যের মোবাইলে রিচার্জ করে অতিরিক্ত ২০ টাকা নেওয়া বৈধ হবে। (ইবনে মাজাহ-২৪৩২, রদ্দুল মুহতার-৬/৬-৫)

প্রসঙ্গ : দাড়ি

মাও. আসাদুজ জামান
ভাঙ্গা, ফরিদপুর।

জিজ্ঞাসা :

আমি একজন বয়স্ক পুরুষ, আমার কাছে দাড়ি খুব পছন্দনীয়; কিন্তু আমার দাড়ি ওঠেনি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দাড়ি না ওঠার কারণে পদ পাইনি। আমি শুনেছি ক্ষুর ব্যবহার করলে দাড়ি গজায়। এ ক্ষেত্রে আমার জন্য ক্ষুর ব্যবহার করে দাড়ি উঠানোর চেষ্টা করা যাবে কি?

সমাধান :

চেহারায় দাড়ি ওঠা না ওঠা নিজের ইচ্ছাধীন নয়। বরং সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলার কুদরতের ওপর নির্ভরশীল। তাই দাড়ি না ওঠার দ্বারা বান্দা গোনাহগার হবে না। তা সত্ত্বেও কেউ চাইলে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে চিকিৎসাস্বরূপ চেহারায় ক্ষুর বা ব্লেড চালাতে পারবে। তবে দাড়ি গজানোর পর কোনোক্রমেই ক্ষুর চালাতে পারবে না। (আহসানুল ফাতাওয়া-৮/৭৭, ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া-৬/২৬৯)

প্রসঙ্গ : জানাযা

মুহা: আব্দুস সামাদ

জিজ্ঞাসা :

শহরে বসবাসকারী কোনো ব্যাক্তির জানাযা ওই এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেব আদায় করে ফেলে। অতঃপর তাকে গ্রামে নিয়ে সেখানে দ্বিতীয় জানাযা দিতে পারবে কি না?

সমাধান :

যদি মৃত ব্যক্তির প্রাপ্তবয়স্ক অভিভাবকের উপস্থিতিতে বা অনুমতিক্রমে একবার জানাযা পড়া হয় তাহলে দ্বিতীয়বার তার জানাযা পড়া জায়েয হবে না। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/১৬৪, সারহুন নেকায়া-১/৩২২)

প্রসঙ্গ : চেহারার পর্দা, মুরগি ডেসিং

সেমিনার কর্তৃপক্ষ
টঙ্গী, গাজীপুর।

জিজ্ঞাসা :

১. মহিলাদের চেহারা হিজাব বা সতরের অন্তর্ভুক্ত কি না? তারা বাসাবাড়িতে রাস্তা-ঘাটে, স্কুলে-কলেজে, অফিস-আদালতে চেহারা খুলে রাখবে না ঢেকে রাখবে? ইহা একটি আন্তর্জাতিক বিতর্কিত বিষয়ে রূপ নিয়েছে, তাই এর একটি চূড়ান্ত সমাধান অপরিহার্য।

২. হাঁস-মুরগি ইত্যাদির প্রচলিত ড্রেসিং প্রদ্ধতি শরীয়তসম্মত কি না? (এমতাবস্থায় সেগুলো অধিক মাত্রার গরম পানি এবং ময়লা-আবর্জনাযুক্ত নাপাক পানি দ্বারা একাধিক বার ড্রেসিং করা হয়)

সমাধান-১ :

শরীয়তের আলোকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে মহিলাদের পূর্ণ শরীর এমনকি চেহারাও হিজাবের অন্তর্ভুক্ত। কেননা পর্দাও হিজাবের মূল কারণ ফেতনার ভয়। আর এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত অধিক ফেতনার কারণ। তাই কোরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে ফোকাহায়ে কেরাম মহিলাদের জন্য পরপুরুষের সামনে নিজ চেহারা খোলাকে নাজায়েয বলেছেন। সুতরাং কোনো মহিলার জন্য বিনা প্রয়োজনে রাস্তা-ঘাটে, স্কুল-কলেজে ও অফিস-আদালতে নিজের চেহারা খুলে চলাফেরা করা সম্পূর্ণ নাজায়েয, এমনকি নিজ ঘরে স্বামী ও মাহরাম ব্যক্তি তথা পিতা, ভাই ছেলে ইত্যাদি ছাড়া অন্য কারো সামনেও চেহারা খুলে কথা বলা জায়েয নেই। (সূরা আহযাব-৫৯, তিরমিযী শরীফ-১১৭৩)

সমাধান-২ :

হাঁস-মুরগি ইত্যদির ড্রেসিং যদি এমন গরম পানি দ্বারা করা হয়, যার তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রির কম, এক মিনিট বা দেড় মিনিট সময় ওই পানিতে চুবিয়ে রাখা হয় এবং এর দ্বারা ভেতরের নাপাকি গোস্তের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে তাহলে এভাবে ড্রেসিং করা হাঁস-মুরগি হালাল। আর প্রচলিত ড্রেসিং পদ্ধতি সরে জমিনে দেখা গেছে যে পানির তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রির চেয়ে কম এক মিনিট বা তার চেয়ে কম সময় ওই পানিতে চুবিয়ে রাখা হয় এতে নাপাকি গোস্তে ছড়াতে পারে না বিধায় তা খাওয়া হালাল। তবে পানি যদি নাপাক হয় তাহলে পবিত্র পানিতে ভালোভাবে ধোয়ার দ্বারা পবিত্র হয়ে যাবে। (আদ দুররুল মুখতার-১/৩৩৪, আহসানুল ফাতাওয়া-২/৯৬)